নতুন ক্রিয়া-কলাপ, রীতিনীতি, চালচলন ধর্মের নামে প্রচলিত করত অমঙ্গলের উপক্রম করিতেছে, কোন চোর-ডাকাত লোকদের আস্থা লাভ করিয়া চুরি-ডাকাতির সুবিধা অন্বেষণ করিতেছে, কেহ কোন রমণীকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে বা কোন দাস-দাসী খরিদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে; এইরূপ স্থানে তুমি তাহাদের অনিষ্টকর দোষ অবগত থাকা সত্ত্বেও না বলিলে সংশ্লিষ্ট লোকগণ বিপন্ন হইতে পারে। এমতাবস্থায়, তাহাদের দোষ পরিষ্কাররূপে জানাইয়া দেওয়া উত্তম। এই সকল স্থানে দোষ প্রকাশ না করিলে প্রকারান্তরে মুসলমানদের অনিষ্ট করা হয় এবং তাহাদের প্রতি তোমার মমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সাফাই সাক্ষীর পক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা বৈধ। তদ্রূপ কাহারও সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলে পরামর্শদাতার পক্ষে ঐ ব্যক্তির দোষ ব্যক্ত করাও অসঙ্গত নহে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ফাসিকের দোষ-ত্রুটি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর, যেন লোকে তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে।" যে স্থানে ফাসিকের কার্য-কলাপে বিপদাপদের আশঙ্কা রহিয়াছে, তদ্রূপ স্থানেই এই আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। অনর্থক যেখানে সেখানে অন্যের দোষ ব্যক্ত করা বৈধ নহে।

জ্ঞানীগণ বলেন, তিন শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে অভিযোগ করিলে গীবত হয় না; যথা– (১) অত্যাচারী বাদশাহ বা শাসনকর্তা; (২) বিদ্‌আতী অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীয়ত বহির্ভূত নবপ্রথা, ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি, চালচলন ধর্মের নামে প্রচলন করে ও (৩) যে ফাসিক প্রকাশ্যে পাপকার্যে লিপ্ত থাকে। তাহারা নিজেদের দোষ গোপন করে না এবং অপরে তাহাদের দোষ ব্যক্ত করিলে তাহারা দুঃখিত হয় না বলিয়াই এরূপ ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা সঙ্গত।

পঞ্চম স্থান—কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে যাহাতে কোন দোষের আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু সেই নাম লইলে সে দুঃখ পায় না, তবে, তদ্রূপ নামে তাহাকে ডাকিলে কোন দোষ নাই; যথা ঃ– আ'মশ ('রাতকানা' একজন প্রখ্যাত আলিমের এই উপাধি ছিল), আ'রাজ (খঞ্জ' বলিয়া না ডাকিয়া অন্য কোন ব্যাজবাক্যে তাহাদিগকে আহবান করা উত্তম; যেমন– অন্ধকে 'বসীর' (দর্শক) বা চশমপুশীদা (দর্শনসংযমী) ইত্যাদি বলিবে।

ষষ্ঠ স্থান—যাহারা লোকলজ্জার ভয় না করিয়া প্রকাশ্যভাবে অসৎকর্ম ও ব্যভিচার করে এবং নিজেদের কাজকে দোষাবহ মনে করে না, তেমন লোকের দোষ বর্ণনা করা বৈধ। যেমন– দুর্বৃত্ত, নপুংসক, মদ্যপ, মাতাল ইত্যাদি।

গীবতের কাফ্‌ফারা—গীবতের পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় এই– (১) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা; ইহাতে তাঁহার নিকট নিন্দুক গীবত করিয়া যে অভিযোগের পাত্র হইয়াছে, সেই অন্যায় হইতে সে পরিত্রাণ পাইতে পারে, এবং (২) নিন্দিত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা; ইহাতে নিন্দুক নিন্দিত

ব্যক্তির প্রতি যে অবিচার করিয়াছে, ইহার দায়িত্ব হইতে সে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, (দুনিয়াতে) যাহার মান-মর্যাদা বা অর্থের হানি করা হইয়াছে, কিয়ামত দিবস আগমনের পূর্বেই তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া লওয়া উচিত। সেইদিন ধন-দৌলত, স্বর্ণ-রৌপ্য কোনই কাজে লাগিবে না। তখন অনিষ্টের বিনিময়ে অত্যাচারীর পুণ্য অত্যাচারিতকে দেওয়া হইবে। অত্যাচারীর আমলনামায় কোন পুণ্য না থাকিলে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপ তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হা এক রমণীকে বলিলেন– "তুমি বড় বাচাল।' রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "হে আয়েশা, তুমি গীবত করিলে; ঐ রমণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, নিন্দিত ব্যক্তির পাপ মোচনের জন্য নিন্দুককে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করাই যথেষ্ট এবং নিন্দিত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা ভিক্ষার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু হাদীসের অন্যান্য উক্তি হইতে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। নিন্দিত ব্যক্তির পরলোকগমন করিয়া থাকিলে তাহার মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা আবশ্যক। সে জীবিত থাকিলে লজ্জিত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবে এবং সবিনয়ে বলিবে– "আমি মিথ্যা বলিয়াছি, অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" এতদ্‌সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করিলে প্রশংসা ও উত্তম ব্যবহারে তাহার মনস্তুষ্টি বিধানে তৎপর হইবে। ইহাতে সে ক্ষমা না করিলে বুঝিবে যে, ইহা তাহার ন্যায্য দাবী। ক্ষমা করা না করা তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যাহা করিয়াছ উহা পুণ্যরূপে তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইবে এবং কিয়ামতের দিন নিন্দার বিনিময়ে নিন্দিত ব্যক্তিকে উহা প্রদান করা হইবে। কিন্তু নিন্দুককে ক্ষমা করিয়া দেওয়াই নিন্দিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম।

পূর্ববর্তী কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নিন্দুককে ক্ষমা করেন নাই এবং বলেন, তাঁহাদের আমলনামায় উহার চেয়ে উত্তম কোন পুণ্য নাই। কিন্তু নিন্দুককে ক্ষমা করিয়া দিলেই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্য পাওয়া যাইবে। এক ব্যক্তি হযরত হাসান বস্‌রীর (র) নিন্দা করিয়াছিল। তিনি এক থালা খোরমা উপহারস্বরূপ তাহাকে এই বলিয়া পাঠাইলেন– "শুনিলাম আপনি স্বীয় ইবাদত আমার জন্য উপহার পাঠাইয়াছেন; প্রতিদানের আমার আশা ছিল; কিন্তু পূর্ণ প্রতিদানে অক্ষম বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি।"

নিন্দিত ব্যক্তিকে যাহা বলা হইয়াছে ক্ষমা প্রার্থনাকালে তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলে ক্ষমা সঙ্গত হয় না। কেননা, অপর লোক কি বলিয়াছে না বলিয়াছে, উহা অবগত না হইলে কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হওয়াই সঙ্গত নহে; এমতাবস্থায়, সে ক্ষমা করিবে কিরূপে?

ত্রয়োদশ আপদ—ভ্রুকুটি করা ও একজনের কথা বিকৃত করিয়া মিথ্যা জোর দিয়া অপরজনের কানে লাগানো। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ

অর্থাৎ "যাহারা বিদ্রুপ করে কানে কানে কথা লাগাইয়া বেড়ায় (তাহাদের কথা বিশ্বাস করিও না।)"

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ অর্থাৎ "নিরতিশয় অনিষ্ট রহিয়াছে- প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে অসাক্ষাতে দোষ প্রকাশ করে (কানকথা লাগায়)" حَمَّالَتَ الْحَطَبِ "যে কাঠের বোঝা বহন করিয়া আনে" অর্থাৎ অগোচরে নিন্দোক্তি করে, লোককথা কানে কানে লাগাইয়া ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করে (সে অতি শীঘ্র দোষখে প্রবেশ করিবে)। এই সকল আয়াতে চুগোলখোরী সম্বন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "চুগোলখোর (অর্থাৎ যে ব্যক্তি একজনের কথা অপ্রিয়ভাবে অপরজনের কানে লাগায়) বেহেশতে যাইবে না।" তিনি বলেন- "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিকৃষ্ট জানাইয়া দিতেছি- যে ব্যক্তি একজনের কথা বিকৃত করিয়া অন্যজনের কানে দেয়, মিথ্যা যোজনা করিয়া বলে এবং মানুষকে ক্রুদ্ধ ও বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলে, সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট।" তিনি বলেন- "আল্লাহ্ বেহেশ্‌ত সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 'বল।' ইহা বলিল- 'যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করিবে সে-ই ভাগ্যবান।' আল্লাহ্ বলিলেন- 'আমার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ করিয়া বলিতেছি, আট প্রকার মানুষকে তোমার দিকে যাইতে দিব না। (তাহারা হইতেছে) (১) মদ্যপায়ী; (২) অবিরত ব্যভিচারী; (৩) চুগলখোর; (৪) দায়্যুস (অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়াও তাহাকে প্রতিরোধ করে না।); (৫) গায়িকা-নর্তকী; (৬) দুর্বৃত্ত ব্যভিচারী নপুংসক; (৭) আত্মীয়তা ছেদনকারী এবং (৮) যে ব্যক্তি বলে আমি আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ যে, অমুক কাজ করিব, অথচ ইহা করে না।"

হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা গেল। হযরত মূসা আলায়হিস সালাম বহুবার প্রান্তরে গিয়া সমবেতভাবে বারিবর্ষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বৃষ্টিপাত হইল না। পরে ওহী অবতীর্ণ হইল- "তোমাদের মধ্যে একজন চুগোলখোর রহিয়াছে, এইজন্য তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিব না।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম নিবেদন করিলেন- "হে খোদা! সে কোন্ ব্যক্তি? আমি তাহাকে বাহির করিয়া দিব।" উত্তর আসিল- "আমি চুগোলখোরকে মন্দ জানি; আর স্বয়ং চুগোলখোরী করিব?" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- "চোগলখোরী হইতে তওবা কর।" সকলেই তওবা করিল এবং অবিলম্বে বৃষ্টিপাত হইল।

কথিত আছে, এক ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞলোকের অন্বেষণে সাত শত ক্রোশ পথ চলার পর একজন হাকীমকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- (১) " কোন পদার্থ আকাশ অপেক্ষা বিস্তৃত? (২) কোন্ প্রদার্থ পৃথিবী অপেক্ষা গুরুভার? (৩) কোন্ পদার্থ প্রস্তর অপেক্ষা কঠিন? (৪) কোন্ প্রদার্থ আগুন অপেক্ষা গরম? (৫) কোন্ পদার্থ বরফ অপেক্ষা ঠান্ডা? (৬) কে সমুদ্র অপেক্ষা ধনবান? (৭) কোন্ ব্যক্তি অনাথ সন্তান অপেক্ষা হীন

ও নিঃসহায়?" হাকীম বলিলেন- (১) "সত্য আকাশ অপেক্ষা বিস্তৃত; (২) নিষ্পাপের উপর মিথ্যাপবাদ পৃথিবী অপেক্ষা গুরুভার; (৩) কাফিরের অন্তর প্রস্তর অপেক্ষা কঠিন, (৪) হিংসা আগুন অপেক্ষা গরম; (৫) যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের অভাব মোচন করে না, তাহার মন বরফ অপেক্ষা ঠান্ডা; (৬) অল্পে পরিতুষ্ট ব্যক্তির হৃদয় সমুদ্র অপেক্ষা ধনবান; (৭) যাহাকে চুগোলখোর বলিয়া লোকে চিনিয়াছে, সে অনাথ সন্তান অপেক্ষা হীন ও নিঃসহায়।"

চুগোলখোরীর পরিচয়—একের কথা অপরের কানে লাগানোই শুধু চুগোলখোরী নহে, বরং অপরের পীড়াদায়ক প্রতিটি বাক্য ও কর্মকথা, ইঙ্গিত বা লেখনী যে কোন প্রকারেই প্রকাশ করা হউক না কেন, চুগোলখোরীর মধ্যে গণ্য। যে গোপন রহস্য প্রকাশ করিলে অপরে দুঃখিত হয়, তাহা প্রকাশ করা অসঙ্গত। কিন্তু কেহ কাহারও ধনহানির গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে ইহা প্রকাশ করা বৈধ। তদ্রূপ কেহ কোন মুসলমানের অনিষ্টের গোপন পরিকল্পনা করিয়া থাকিলে ইহা প্রকাশ করাও বৈধ।

চুগোলখোরী শ্রবণকারীর কর্তব্য—কেহ যদি তোমাকে জানায় যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকের এইরূপ কথা বলিতেছে, তোমার বিরুদ্ধে এইরূপ কাজ করিতেছে বা এবং বিধ কোন কথা বলিতেছে, এমতাবস্থায়, তোমার ছয়টি কর্তব্য রহিয়াছে; যথা- (১) সংবাদদাতার কথা বিশ্বাস করিবে না। কারণ, চুগোলখোর ফাসিক এবং ফাসিকের কথা শুনিতে আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন। (২) সংবাদদাতাকে উপদেশ দিবে এবং তাহাকে চুগোলখোরী করিতে নিষেধ করিবে; কারণ অসৎকর্মে প্রতিরোধ অবশ্য কর্তব্য। (৩) আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে সংবাদদাতাকে শত্রু মনে করিবে; কেননা, চুগোলখোরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যায় না। (৪) কাহারও প্রতি কু-ধারণা পোষণ করিবে না; কারণ কু-ধারণা পোষণ করা হারাম। (৫) সংবাদদাতার কথার সত্যতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করিবে না; কারণ, আল্লাহ্ উহা নিষেধ করিয়াছেন (৬) 'যাহা নিজের জন্য অপ্রিয় মনে কর, তাহা অপরের জন্যও অপ্রিয় মনে করিবে' এই উপদেশ পালনার্থ তাহার চুগোলখোরীর বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না, গোপন রাখিবে। এই ছয়টি নির্দেশ পালন অবশ্য কর্তব্য।

হযরত ওমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি চুগোলখোরী করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন- "তুমি মিথ্যা বলিয়া থাকিলে তুমি ফাসিক লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا অর্থাৎ 'যদি তোমার নিকট কোন ফাসিক লোক খবর লইয়া আসে ভালমতে তাহকীক (অনুসন্ধান) করিয়া লও।' আর তুমি সত্য বলিয়া থাকিলে তুমি চুগোলখোরদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন- هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ অর্থাৎ 'যাহারা বিদ্রূপ করে, কানে-কানে কথা লাগাইয়া বেড়ায় তাহাদের কথা বিশ্বাস করিও না।' সুতরাং তোমার ইচ্ছা হইলে তওবা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব।" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি তওবা করিল।

এক ব্যক্তি একজন হাকীমকে বলিল– "অমুক ব্যক্তি আপনার সম্বন্ধে এইরূপ বলিল।" হাকীম বলিলেন– "বহুদিন পর তুমি আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছ। কিন্তু তুমি তিনটি ক্ষতি করিয়া গেলে– (১) একজন ভ্রাতার প্রতি আমার মন বিগড়াইলে, (২) আমার প্রশান্ত হৃদয়কে ব্যাকুল করিলে এবং (৩) আমার নিকট তোমাকে ফাসিক বলিয়া পরিচয় দিলে।" একদা খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক প্রখ্যাত আলিম জহ্‌রীর সহিত বসিয়া ছিলেন। তখন খলীফা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি কি আমার সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছ?" সে অস্বীকার করিলে তিনি বলিলেন– "একজন ন্যায়-পরায়ণ বিশ্বস্ত পুরুষ সংবাদ দিয়াছে।" তখন জহ্‌রী বলিলেন– "হে আমীরুল মুমিনীন, চুগোলখোর ন্যায়-পরায়ণ হয় না।" খলীফা জহ্‌রীর কথা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে স্বচ্ছন্দে তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেন– "যে ব্যক্তি অপরের কথা তোমার নিকট বলে, সে অবশ্যই তোমার কথাও অপরের নিকট বলিবে। এইরূপ লোক হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, তাহাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করা আবশ্যক। কারণ, গীবত, খেয়ানত, কৃত্রিমতা, হিংসা, সত্যের সহিত মিথ্যার সংযোজন, কপটতা, প্রতারণা ইত্যাদি তাহারই কর্ম। আর তাহার খেয়ানতের দরুনই এই সমস্ত অসৎ কর্মে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। বুযুর্গগণ বলেন– "অকপটতা সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। কিন্তু চুগোলখোর এত দুর্বৃত্ত যে, তাহার অকপটতাও কেহ পছন্দ করে না।" হযরত মুস্‌আব ইব্ন যুবায়র (র) বলেন– "আমার মতে চুগোলখোরী করা অপেক্ষা চুগোলখোরের কথা শ্রবণ করা অধিকতর দূষণীয়; কেননা, চুগোলখোরীর উদ্দেশ্য অন্যকে বিরাগভাজন করিয়া তোলা। চুগোলখোরের কথা শ্রবণ করিলে এই উদ্দেশ্য সফল হয় এবং ইহাতে যেন চুগোলখোরকে চুগোলখোরীর অনুমতি দেওয়া হয়।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "চুগোলখোর হারামযাদা।"

চুগোলখোর ও কলহপ্রিয় লোকের অনিষ্টকারিতা অপরিসীম। তাহাদের দরুন বহু খুন-খারাবী হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি স্বীয় গোলাম বিক্রয় করিতে যাইয়া বলিল– "সে একজনের কথা অপরজনের কানে লাগায় এবং এইরূপে অশান্তির সৃষ্টি করে; এতদ্ব্যতীত তাহার অপর কোন দোষ নাই।" এই দোষ উপেক্ষা করত এক ব্যক্তি গোলামটি ক্রয় করিয়া গৃহে নিয়া গেল। এক দিন গোলাম গৃহকর্ত্রীকে গোপনে বলিল– "আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসেন না, তিনি এক দাসী ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহার কণ্ঠের উপর হইতে যদি কয়েকটি চুল ক্ষুর দিয়া কাটিয়া আনিতে পারেন, তবে এমন মন্ত্র পড়িয়া দিব যে, তিনি আপনার প্রতি আশিক হইয়া পড়িবেন।" অপরদিকে, গোলাম কর্তাকে বলিল– "আপনার স্ত্রী পর-পুরুষের প্রতি আসক্ত। তিনি আপনাকে হত্যার চেষ্টায় রহিয়াছেন। রজনীতে ঘুমের ভান করিয়া শুইয়া থাকিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

রজনী আগমনে গৃহকর্তা শয্যা গ্রহণ করিল। গৃহস্বামিনী একটি ক্ষুর লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং স্বামীর দাড়ীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিল। ইহা দেখিয়া স্বামীর দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, স্ত্রী তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। সুতরাং তৎক্ষণাত সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ফেলিল। সংবাদ শুনিয়া গৃহস্বামিনীর আত্মীয়-স্বজন আসিয়া গৃহস্বামীকে হত্যা করিল। এইরূপে আরও বহু হত্যাকান্ড সংঘটিত হইল।

চতুর্দশ আপদ—পরস্পর শত্রুদের মধ্যে দ্বিমুখী হওয়া। এমতাবস্থায়, প্রত্যেককেই এইরূপ কথা বলিতে হয় যাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট থাকে; একের কথা বিকৃত ও অপ্রিয় করত অপরের কানে লাগাইতে হয় এবং প্রত্যেকের নিকটই প্রকাশ করিতে হয়– "আমি তোমারই অন্তরঙ্গ বন্ধু।" এইরূপ দ্বিমুখী হওয়া চুগোলখোরী অপেক্ষা মন্দ। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "ইহকালে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী হইবে, পরকালে তাহার দুই রসনা হইবে।" তিনি আরও বলেন– "দ্বিমুখী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে নিকৃষ্ট।"

যে ব্যক্তি পরস্পর শত্রুদের মধ্যে বন্ধুভাবে থাকিতে চায় তাহার কর্তব্য এই– (১) একজনের নিকট হইতে শোনা কথা অন্যের নিকট না বলিয়া চুপ থাক; (২) প্রকাশ্যে মুখের উপর বলিয়া দেওয়া; অথবা, (৩) অসাক্ষাতে অসত্য না বলা; সাক্ষাতে এক কথা, অসাক্ষাতে অন্য কথা বলিলে মুনাফিক হইতে হয়; (৪) একের কথা কখনও অন্যের নিকট না বলা এবং (৫) 'আমি তোমার বন্ধু' ইহা প্রত্যেকের নিকট না বলা।

হযরত ইব্ন ওমর রাযিয়াল্লাহ্ আনহুর নিকট লোকে নিবেদন করিল– "আমরা আমীরদের নিকট যাইয়া এমন কথা বলিয়া থাকি যাহা তথা হইতে বাহির হইলে আর বলি না।" তিনি বলিলেন– "রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামের যমানায় আমরা এইরূপ ব্যবহারকে কপটতা বলিয়া জানিতাম। যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে আমীরদের নিকট গমন করে এবং তথায় এমন কথা রচনা করে যাহা সে তাহাদের অগোচরে বলে না, সে মুনাফিক। অবশ্য শরীয়তসম্মত অপরিহার্য কারণে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অত্যাচারী আমীরের নিকট সেইরূপ কিছু বলার বিধান আছে।"

পঞ্চদশ আপদ—প্রশংসা করা ও ইহাতে অতিরিক্ত করা। রসনার এই আপদে ছয় প্রকার অনিষ্ট রহিয়াছে। তন্মধ্যে চারিটি অনিষ্ট প্রশংসাকারীর ও দুইটি প্রশংসিতের।

প্রশংসাকারীর অনিষ্ট ঃ প্রথম অনিষ্ট– অতিরিক্ত প্রশংসা করা এবং ইহা করিতে যাইয়া কিছু মিথ্যার সংযোজন করা। হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি লোকের অতিরিক্ত প্রশংসা করে, পরকালে তাহার রসনা এত দীর্ঘ হইবে যে, ইহা মাটিতে ছেঁচড়াইবে এবং তাহার পা তাহার রসনার উপর যাইয়া পড়িবে ও সে আছাড় খাইয়া পতিত হইবে।

দ্বিতীয় অনিষ্ট—অতিরিক্ত প্রশংসা করিতে গেলে কপটতা দেখা দেয়। প্রশংসাকারী প্রশংসিত ব্যক্তিকে বলে- "আমি তোমাকে ভালবাসি।" কিন্তু তাহার অন্তরে সেই ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা নাও থাকিতে পারে।

তৃতীয় অনিষ্ট—প্রশংসাকালে এইরূপ গুণের কথা উল্লেখ করা হয় যাহা প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে আছে কিনা প্রশংসাকারী নিজেই তাহা যথার্থরূপে অবগত নহে। প্রশংসাকালে বলা হইয়া থাকে- "আপনি পুণ্যবান, পরহেযগার ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ আলিম ইত্যাদি।" কিন্তু প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে হয়ত অনেক ত্রুটি রহিয়াছে অথবা সেই গুণগুলি পূর্ণমাত্রায় নাই।

এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে অপরের প্রশংসা করিল। তিনি বলিলেন- "আফসোস, তুমি তাহাকে হত্যা করিলে!" তৎপর তিনি আবার বলিলেন- "কাহারও প্রশংসা করা প্রয়োজন হইলে বলিবে- 'তাহাকে আমি এইরূপ বলিয়া মনে করি।' আল্লাহ্‌র নিকট তাহার কোন দোষ থাকিলে ইহা হইতে তাহাকে নির্দোষ করিতেছি না (অর্থাৎ ভালমন্দ) পবিত্র-অপবিত্র আল্লাহ্‌ই জানেন।" তোমার কথা ঠিক হইয়া থাকিলে ঐ ব্যক্তির হিসাব আল্লাহ্‌র হাতে।"

চতুর্থ অনিষ্ট—তুমি যাহার প্রশংসা করিতেছ, সে হয়ত যালিম। তোমার প্রশংসায় সে আনন্দিত হইতে পারে, অথচ যালিমকে আনন্দিত করা সঙ্গত নহে। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি ফাসিকের প্রশংসা করে, আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।"

প্রশংসিতের অনিষ্ট—প্রশংসিত ব্যক্তির দ্বিবিধ অনিষ্টের কারণ রহিয়াছে।

প্রথম—অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শ্রবণ করিলে মানুষের হৃদয়ের অহঙ্কার ও আত্মগর্ব আসে। একদা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চাবুক হস্তে বসিয়া ছিলেন। তখন 'হারূত' নামক এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। এক ব্যক্তি আগন্তুকের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিলেন- "তিনি রাবীয়া গোত্রের নেতা।" হারূত আসন গ্রহণ করিলে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করিলেন। হারূত নিবেদন করিলেন- "ইয়া আমীরুল মুমিনীন, আমার কি অপরাধ?" তিনি বলিলেন- "এই ব্যক্তি কি বলিল, তুমি শুন নাই?" হারূত বলিলেন- "হাঁ, শুনিয়াছি।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন- "ইহাতে তোমার অন্তরে অহঙ্কার আসিতে পারে বলিয়া আমার আশঙ্কা হইল। আমি তোমার অহঙ্কার চুর্ণ করিয়া দিতে চাহিলাম।"

দ্বিতীয়—উপযুক্ততা ও বিদ্যার প্রশংসা করিলে প্রশংসিত ব্যক্তি মনে মনে বলিবে- "আমি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছি।" সুতরাং অধিকতর উন্নতির জন্য সে আর পরিশ্রম করিবে না এবং এইরূপে তাহার ভবিষ্যত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। এইজন্যই এক ব্যক্তিকে প্রশংসা করা হইতেছে শুনিয়া রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-

"আফসোস, তুমি তাহাকে হত্যা করিলে।" ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রশংসিত ব্যক্তি ইহা শুনিলে ভবিষ্যত উন্নতির চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "সম্মুখে কাহাকেও প্রশংসা করা অপেক্ষা (হত্যা করার উদ্দেশ্যে) তীক্ষ্ণ ছুরি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করা বরং ভাল।" হযরত যিয়াদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন- "স্বীয় প্রশংসা শুনিয়া যে ব্যক্তি আত্মপ্রসাদ লাভ করে, শয়তান আসিয়া তাহাকে তাহার মর্যাদা হইতে নামাইয়া দেয়। কিন্তু মুমিন নিজকে চিনে বলিয়া নিজের প্রশংসা শুনিলে বিনত হয়।"

পাত্র বিশেষে প্রশংসার বিধান—যেখানে উল্লিখিত ছয়টি আপদের আশঙ্কা নাই, এমন স্থানে প্রশংসা করা ভাল। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের প্রশংসা করিয়াছেন। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি বলেন- "হে ওমর, আল্লাহ্ আমাকে রাসূল করিয়া না পাঠাইলে তোমাকেই পাঠাইতেন।" তিনি আরও বলেন- "সমস্ত বিশ্ববাসীর ঈমান একত্র করিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঈমানের সঙ্গে ওজন করিলে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঈমান অধিক হইবে।" স্বীয় সাহাবাগণের এইরূপ উচ্চ প্রশংসা করার কারণ এই যে, তিনি অবগত ছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের কোনই অনিষ্ট হইবে না।

আত্মপ্রশংসা অসঙ্গত—আত্মপ্রশংসা মন্দ ও ঘৃণ্য। আল্লাহ্ ইহা নিষেধ করিয়া বলেন ঃ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ "অনন্তর তোমরা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র বলিও না।"

ব্যক্তি বিশেষে আত্মপ্রশংসা সঙ্গত—মানবজাতির পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত হইলে লোকে যেন তাঁহার অনুসরণ করে, এই উদ্দেশ্যে স্বীয় অবস্থা প্রকাশ করাতে কোন দোষ নাই; যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আমি আদম সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই জন্য আমি গর্ব করি না, বরং যে আল্লাহ্ আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, তাঁহার গৌরব করিয়া থাকি।" জগতবাসী যেন তাঁহার অনুসরণ করে, এই জন্যই তিনি এই কথা বলিয়াছেন। হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম বলিয়াছিলেন-

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ "সমগ্র রাজ্যের ধনভাণ্ডারের উপর আমাকে নিযুক্ত কর। আমি অবশ্যই জ্ঞানবান রক্ষক।"

প্রশংসিত ব্যক্তির কর্তব্য—প্রশংসিত ব্যক্তির অন্তরে অহঙ্কার ও গর্ব স্থান পাওয়া উচিত নহে। পরিণাম চিন্তায়ই তাহার ব্যাকুল থাকা আবশ্যক। পরিণামে কাহার অবস্থা কিরূপ হইবে, কেহই বলিতে পারে না। যে ব্যক্তি দোযখ হইতে রক্ষা পাইবে না, কুকুর এবং শূকরও তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'আমি দোযখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি' ইহা কেহই বলিতে পারে না। প্রশংসিত ব্যক্তির আরও অনুধাবন করা আবশ্যক যে,

তাহার গোপনীয় অবস্থা জানিতে পারিলে কেহই তাহার প্রশংসা করিত না। অতএব, আল্লাহ্ যে তাহার গোপনীয় দোষসমূহ লুক্কায়িত রাখিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। লোকমুখে স্বীয় প্রশংসা শুনিলে ইহাতে ঘৃণা প্রকাশ করা আবশ্যক এবং অন্তরেও প্রগাঢ় ঘৃণা পোষণ করা কর্তব্য। লোকে এক বুযুর্গকে প্রশংসা করিলে তিনি বলিলেন– "হে খোদা, লোকে আমার অবস্থা জানে না, তুমি আমার প্রকৃত অবস্থা অবগত আছ।" অপর এক বুযুর্গ লোকমুখে স্বীয় প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন– "হে খোদা, তাহারা প্রশংসা করিয়া আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিতেছে, অথচ প্রশংসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি। তুমি সাক্ষী থাক, তাহাদের শত্রুতার দরুন আমি তোমার নৈকট্য প্রার্থনা করিতেছি।"

লোকে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশংসা করিলে তিনি বলিলেন– "হে খোদা, আমার সম্বন্ধে লোকে যাহা বলিতেছে, এইজন্য আমাকে দায়ী করিও না এবং তাহারা অজ্ঞাতসারে আমার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ক্ষমা কর। আর তাহারা আমাকে যেরূপ ধারণা করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আমাকে উৎকৃষ্ট কর।" এক ব্যক্তি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভালবাসিত না; অথচ কপটভাবে তাঁহার প্রশংসা করিত। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– "তুমি রসনায় যাহা বলিতেছ, আমি তদপেক্ষা নীচ এবং অন্তরে তুমি যেভাব পোষণ কর তদপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ।"

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং উহা হইতে পরিত্রাণের উপায়

ক্রোধ সীমা ছাড়াইয়া প্রবল হইয়া উঠিলে জঘণ্য হইয়া থাকে। অগ্নি ক্রোধের মূল এবং অন্তরের উপর ইহার প্রভাব। শয়তানের সহিত ক্রোধের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে স্বয়ং বলিয়াছে-

خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ অর্থাৎ "তুমি আমাকে অগ্নি হইতে সৃজন করিয়াছ এবং তাহাকে (আদমকে) মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছ।" আগুন সর্বক্ষণ গতিশীল ও চঞ্চল; আর মাটি ধীর ও শান্ত। ক্রোধান্ধ ব্যক্তির সহিত হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া শয়তানের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

হযরত ইব্নে ওমর রাযিয়াল্লাহ্ আন্হুমা রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্র ক্রোধ হইতে আমাকে দূরে রাখিতে পারে, এরূপ কোন কাজ আছে?" তিনি বলিলেন- "তাহা এই যে, তুমি ক্রুদ্ধ হইবে না।" তিনি আবার নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে এরূপ একটি সংক্ষিপ্ত কাজের কথা বলিয়া দিন যাহাতে আমি উত্তম পরিণামের আশা করিতে পারি।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "স্বেচ্ছায় ক্রুদ্ধ হইও না।" তিনি বারবার একই প্রশ্ন করিতেছিলেন এবং রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বারই ঐ উত্তর দিতেছিলেন। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "সির্কা যেরূপ মধু ধ্বংস করে, ক্রোধ তদ্রূপ ঈমান ধ্বংস করে।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম হযরত ইয়াহ্ইয়া আলায়হিস্ সালামকে বলিলেন- "ক্রুদ্ধ হইও না।" তিনি বলিলেন- "ইহা সম্ভবপর নহে; কেননা, আমি মানুষ।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলিলেন-'ধন জমা করিও না।" তিনি বলিলে-'হাঁ, ইহা সম্ভবপর।"

ক্রোধ দমনের ফযীলত—ক্রোধের মূলোচ্ছেদ মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু ক্রোধ দমন করা নিতান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ অর্থাৎ "এবং ক্রোধ সংবরণকারী ও মানবের মার্জনাকারীকে (আল্লাহ্ ভালবাসেন)।" যাহারা ক্রোধ দমন করিতে পারে এই আয়াতে আল্লাহ্ তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে আল্লাহ্ তাহার উপর হইতে স্বীয় আযাব বিদূরিত করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালনে স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করে, তিনি তাহার ত্রুটি মাফ করেন এবং যে ব্যক্তি রসনা সংযত রাখে আল্লাহ্ তাহার গোপনীয় দোষ লুক্কায়িত রাখেন।" তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহার অন্তর সন্তোষ দ্বারা ভরপুর করিয়া দিবেন।" তিনি বলেন- "দোযখের একটি দ্বার আছে; এই দ্বার দিয়া শরীয়ত বিরুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশকারী ব্যতীত আর কেহই প্রবেশ করিবে না।" তিনি বলেন- "লোক চুমুকে যাহা পান করে, উহার মধ্যে ক্রোধ পান (সংরবণ) অপেক্ষা আর কোন বস্তু পানই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় নহে। যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ্ তাহার অন্তর ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন।"

হযরত ফুযায়ল ইব্‌নে আইয়ায (র), হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) এবং আরও কতিপয় বুযুর্গ একবাক্যে বলেন- "ক্রোধের সময় সহিষ্ণুতা এবং লোভের সময় ধৈর্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজ আর কিছুই নাই।" এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র)-কে কটু কথা বলিল। তিনি মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন- "আমাকে তুমি ক্রুদ্ধ করত শয়তান কর্তৃক আমাকে স্বীয় মর্যাদা হইতে নামাইয়া লইতে চাহিতেছ? ক্ষমতা ও প্রভুত্বের গর্বে আজ আমি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইলে কল্য কিয়ামত দিবস তুমি আমা হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, ইহা কখনও হইতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি নীরব রহিলেন। একজন নবী আলায়হিস্ সালাম লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "এমন কেহ আছে কি, যে আমার উপদেশসমূহ পালন করিবে ও প্রতিজ্ঞা করিবে যে, কখনও ক্রুদ্ধ হইবে না এবং আমার তিরোধানের পর আমার প্রতিনিধি হইয়া থাকিতে ও বেহেশ্‌তে আমার সমান মর্যাদা পাইতে আশা করে?" এক ব্যক্তি স্বীকার করিলেন এবং ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তিনি এই ব্যক্তি দ্বারা আরও দুইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া লইলেন। অনন্তর সেই ব্যক্তি দৃঢ়তার সহিত স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করত উক্ত নবী আলায়হিস্ সালামের প্রতিনিধি হইলেন এবং জগতে 'যুলকুফ্‌ল্' অর্থাৎ দায়িত্ব পালক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

ক্রোধ ও লোভ সৃষ্টির কারণ—প্রয়োজনের সময় অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মানব হৃদয়ে ক্রোধ সৃজন করিয়াছেন, যেন কোন অনিষ্টের কারণ তাহার সম্মুখীন হইলে ক্রোধ তৎক্ষণাত ইহা বিদূরিত করিতে পারে। লোভ সৃজনেও এই একই উদ্দেশ্য রহিয়াছে। ইহাও অস্ত্রের ন্যায় মানুষের কাজে আসিবে এবং মঙ্গলজনক বস্তু তাহার দিকে আকর্ষণ করিবে, উহাই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। এই দুই প্রবৃত্তি মানবজীবনে অপরিহার্য। কিন্তু উহা সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি পাইলে তাহার সমূহ অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

অতি ক্রোধ বুদ্ধি-বিনাশক—ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিয়া বাড়িয়া গেলে মানব হৃদয়ে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে। ইহার ধোঁয়া মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া দিলে বুদ্ধি ও নিপুণতার কার্যালয় অন্ধকারাবৃত্ত হইয়া যায়। বুদ্ধি তখন অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং ফলে, মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। গুহা ধুমে পরিপূর্ণ হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে যেমন কিছুই নয়ন- গোচর হয় না, ক্রোধের সময় মস্তিষ্ক কুঠরীর অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ক্রোধের এইরূপ আধিক্য নিতান্ত জঘণ্য। ক্রোধের সময় মানব হিতাহিত নির্ণয়ে অক্ষম হয় বলিয়াই বুযুর্গগণ ইহাকে 'গোলে আক্‌ল' অর্থাৎ বুদ্ধি-বিনাশক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অত্যল্প ক্রোধ ক্ষতিকর—ক্রোধ সীমা ছাড়াইয়া অত্যন্ত কমিয়া গেলেও ক্ষতিকর। কারণ, ক্রোধই মানুষকে অন্যায় ও গর্হিত কর্মের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে এবং জগতে ধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কপটতা ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে মুসলমানের অন্তরে প্রেরণা যোগায়। আল্লাহ্ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ "কাফির ও মুনাফিকদের সহিত জিহাদ কর এবং তাহাদের উপর কর্কশ ব্যবহার কর।" সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ অর্থাৎ "তাহারা কাফিরদের উপর বড় কঠিন।" এই সমস্ত ক্রোধের অবশ্যম্ভাবী ফল।

ক্রোধের মধ্যম অবস্থা কাম্য—উল্লিখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয়, ক্রোধের আধিক্য ও অত্যল্পতা কাম্য নহে; বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ধর্মবুদ্ধির অধীন ইহার সাম্যভাবাপন্ন অবস্থাই কাম্য। কেহ কেহ মনে করেন, ক্রোধের মূলোৎপাটন রিয়াযতের উদ্দেশ্য। ইহা ভুল ধারণা। কারণ, ক্রোধ মানবের অপরিহার্য অস্ত্রস্বরূপ এবং তাহার জীবদ্দশায় লোভের ন্যায় ক্রোধের মূলোচ্ছেদও অসম্ভব। তবে কোন বিশেষ ধর্ম বা ভাবে মানব তন্ময় হইলে ক্রোধের আত্মগোপন সম্ভবপর এবং তখনই সে মনে করে ক্রোধের মূলোৎপাটন হইয়াছে।

ক্রোধ উত্তেজিত হওয়ার কারণ—কি কারণে ক্রোধ উত্তেজিত হয় এবং কোন্ অবস্থায় গুপ্ত থাকে, উহা বুঝিয়া লওয়া দরকার। মনে কর, এক ব্যক্তির কোন বিশেষ একটি জিনিসের নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু অপরে ইহা ছিনাইয়া লইতে চাহিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। আর যে দ্রব্যের তাহার কোন দরকার নাই, যেমন কাহারও একটি কুকুর আছে এবং ইহা তাহার কোন উপকারেও আসে না, এরূপ স্থলে ইহা যদি কেহ অপহরণ করে বা মারিয়া ফেলে, তবে হয়ত কুকুরের মালিক ক্রুদ্ধ হইবে না। অপরপক্ষে আহার্য সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরবাড়ী, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি ব্যতীত মানুষ কখনও চলিতে পারে না। এমতাবস্থায়,

এবং অন্ন-বস্ত্র ছিনাইয়া লইলে ক্রোধ অবশ্যই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। যাহার যত অধিক অভাব তাহার ক্রোধ তত অধিক এবং সে সেই পরিমাণে অসহায় ও দুঃখিত। মানুষ যে পরিমাণে স্বীয় অভাব ও আবশ্যকতা বর্জন করিবে সেই পরিমাণে সে আজাদী লাভ করিবে। আর যে পরিমাণে অভাব ও আবশ্যকতা বৃদ্ধি পাইবে, সেই পরিমাণে সে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে। মানব সাধনার ফলে এত পরিমাণে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে যে, সে তখন জীবন ধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদির অভাব অনুভব করে। এই সময় মান-মর্যাদা ও ধনের অভাব তাহার মোটেই অনুভব হয় না। জগতের নানাবিধ অতিরিক্ত পদার্থের অভাব হইতেও সে তখন নিষ্কৃতি লাভ করে। সুতরাং মান-মর্যাদার হানি এবং ধন-দৌলত ও অতিরিক্ত দ্রব্যাদি হস্তগত না হওয়া বা অপহৃত হওয়ার নিমিত্ত তাহার অন্তরে তখন আর ক্রোধ উত্তেজিত হইয়া ওঠে না; ইহা তখন স্বতই লয়প্রাপ্ত হয়।

সম্মান লাভের প্রত্যাশী নহে, এমন ব্যক্তির অগ্রে অগ্রে কেহ পথ চলিলে বা সভাস্থলে তাহার অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসিলে ইহাতে তাহার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হয় না। ক্রোধোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিলে মানুষে মানুষে বিরাট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। যাহাতে একের ক্রোধের সঞ্চার হয় অপরে ইহাতে লজ্জায় মাথা হেট করে। অধিকাংশ স্থানে মান-মর্যাদা ও ধন-দৌলত লইয়াই ক্রোধ উত্তেজিত হইয়া উঠে। নিতান্ত ঘৃণ্য ও তুচ্ছ ব্যাপার অবলম্বনেও কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হয়। দাবা ও চৌসরক্রীড়া, কবুতর খেলা বা মদ্যপান প্রভৃতি নিকৃষ্ট ও জঘন্য কর্মে অভস্ত লোকের এই সকল অপকর্মে কোন ত্রুটি ধরিলে তাহার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। কেহ যদি এই প্রকৃতির লোককে বলে- "তুমি দাবা খেলায় তত দক্ষতা লাভ কর নাই, তুমি বেশী মদ পান করিতে অক্ষম, তবে সে ক্রুদ্ধ হয়। মান-সম্ভ্রম, ধন-দৌলত বা অন্যান্য ঘৃণ্য ও তুচ্ছ ব্যাপার অবলম্বনে যে সমস্ত ক্রোধের উৎপত্তি হয়, রিয়াযত দ্বারা মানুষ তৎসমুদয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অবলম্বনে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয় মানুষ ইহা হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে না এবং এই প্রকার ক্রোধের মূলোচ্ছেদ সঙ্গতও নহে।

স্থলবিশেষে ক্রোধ বাঞ্ছনীয়—মানব জীবনে নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদির অপচয় ও অপহরণজনিত ক্রোধ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে স্থানে ক্রোধ মঙ্গলজনক সে স্থানে যেন মানুষ ক্রোধের উত্তেজনায় উন্মত্ত দিশাহারা না হয় এবং ধর্ম-বুদ্ধির বশীভূত থাকে, এইজন্য তাহার সাবধান হওয়া কর্তব্য। সাধনা দ্বারা মানুষ এই প্রকার ক্রোধের আজ্ঞাধীন করিতে সমর্থ হয়। ইহার মূলোৎপাটন অসম্ভব ও অসঙ্গত। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে ক্রোধশূন্য ছিলেন না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আমি তোমাদের মত মানুষ; তোমরা যেরূপ ক্রোধ কর আমিও তদ্রূপ ক্রোধ করি। যদি আমি কাহাকেও

অভিশাপ দেই, কটুবাক্য বলি বা আঘাত করি, তবে হে খোদা, আমার সেই কাজকে তাহার উপর তোমার রহমতের হেতু করিয়া লও।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আছ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তখন নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি ক্রুদ্ধ অবস্থায় যাহা বলিলেন উহাও আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি।" তিনি বলেন- "ইহাও লিখিয়া লও, যে আল্লাহ্ আমাকে সত্য রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ, আমি ক্রুদ্ধ হইলেও সত্য ব্যতীত কোন কথা আমার মুখ হইতে বাহির হয় না।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই কথা বলেন নাই যে, তাঁহার ক্রোধ ছিল না; বরং তাঁহারও ক্রোধ ছিল, কিন্তু ইহা সত্য ও ন্যায়-বিচারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই, তিনি ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

একদা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা ক্রুদ্ধ হইলেন দেখিয়া রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "হে আয়েশা, তোমার শয়তান আসিয়াছে।" তিনি নিবেদন করিলেন- "ইয় রাসূলাল্লাহ্, আপনার কি শয়তান নাই?" উত্তরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "হাঁ, আছে; তবে আল্লাহ্ তাহার উপর আমাকে বিজয়ী করিয়াছেন, সে আমার বশীভূত হইয়া রহিয়াছে; সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে সে আদেশ করে না।" এস্থলেও তিনি ইহা বলেন নাই যে, তাঁহার ক্রোধ প্রবৃত্তি ছিল না।

তাওহীদ প্রভাবে গুপ্ত ক্রোধ—মানব হৃদয় হইতে ক্রোধের মূলোচ্ছেদ সম্ভবপর না হইলেও অবস্থাবিশেষে ইহা গুপ্ত থাকে। অল্প বা অধিক সময়ের জন্যই হউক, কাহারও হৃদয়ে তাওহীদ ভাব (আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস) প্রবল হইয়া তাহাকে তন্ময় করিয়া ফেলিলে সেই ব্যক্তি তখন যাহা কিছু সংঘটিত হইতে দেখে, উহা একমাত্র আল্লাহ্‌র দিক হইতেই সংঘটিত হইতেছে দেখিতে পায়। তেমন ব্যক্তির হৃদয়ে ক্রোধ অদৃশ্যভাবে থাকে এবং মোটেও উত্তেজিত হইয়া উঠে না। যেমন মনে কর, একে অপরের উপর পাথর নিক্ষেপ করিল। আহত ব্যক্তির অন্তরে ক্রোধ অদৃশ্যভাবে থাকিলেও সে কিছুতেই পাথরের উপর ক্রুদ্ধ হয় না। কারণ, সে জানে, জড় পাথরের কোন দোষ নাই; বরং পাথর নিক্ষেপকারীই অপরাধী। তদ্রূপ বিচার অপরাধীকে হত্যার আদেশ কলম দ্বারা লিখিলেও দণ্ডিত ব্যক্তি কলমের উপর ক্রুদ্ধ হয় না। কারণ, কলমের সাহায্যে দণ্ডাদেশ লিখিত হইলেও সে জানে যে, ইহা লেখকের আজ্ঞাধীন এবং তাহার স্বাধীন প্রবর্তনশক্তিতেই কলম পরিচালিত হইয়াছে ও ইহার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। তদ্রূপ, যাহর হৃদয়ে তাওহীদ ভাব প্রবল হইয়া তাহাকে তন্ময় করিয়া ফেলিয়াছে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই জানে যে, সৃষ্টির মাধ্যমে যে কাজ সম্পন্ন হয়, ইহাতে সেই প্রাণীর কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই।

মানবের কয়েকটি বৃত্তির সমন্বয় ও সম্মিলিত চেষ্টায় কার্য সম্পন্ন হয়। ইহারা পরস্পর অধীনতার পাশে আবদ্ধ। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, হস্তপদাদি সঞ্চালনেই কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু হস্তপদাদি সঞ্চালন শক্তির অধীন। শক্তি হস্তপদাদি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যে দিকে চালায় ইহারা সেইদিকে চলিলেও এই ব্যাপারে শক্তি স্বাধীন নহে। শক্তি ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছা আবার মানবের আজ্ঞাধীন নহে। তাহার মনঃপুত হউক বা না হউক, ইচ্ছাকে তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইচ্ছার সহিত শক্তির সংযোগ ঘটিলে হস্তপদাদি সঞ্চালনে কার্য আবশ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত পাথর নিক্ষেপ কার্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, নিক্ষেপকারীর ইচ্ছানুসারে শক্তির সংযোগ হওয়াতেই হস্তপদাদি সঞ্চালনে পাথরটি ঐ ব্যক্তির উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং উহার আঘাত হইত ব্যক্তি বেদনা অনুভব করিয়াছিল। পাথরটি স্বেচ্ছায় নিজ স্বাধীন ক্ষমতায় তাহাকে আঘাত করে নাই এবং এইজন্যই ইহার উপর কেহই ক্রুদ্ধ হয় না।

আবার মনে কর, একমাত্র একটি ছাগলের দুগ্ধ দ্বারাই এক ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করে। এমতাবস্থায়, ছাগলটি মরিয়া গেলে তাহার দুঃখ হয়, কিন্তু কাহারও উপর সে ক্ষুব্ধ হয় না। আবার ছাগলটিকে কেহ বধ করিয়া ফেলিলেও তাওহীদভাবে তন্ময় ব্যক্তির পক্ষে তাহার উপর ক্রুদ্ধ না হওয়াই সঙ্গত। কারণ, তাওহীদের তন্ময়ভাব যাহাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে, নিখিল বিশ্বের সকল কার্য কেবল আল্লাহ্‌র দিক হইতে সম্পন্ন হইতেছে সে দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তি উক্ত পাথর নিক্ষেপকারী ও ছাগলবধকারী উভয়কেই বিশ্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক পরিচালিত দেখিতে পাইয়া তাহাদের উপর কুপিত হইতে পারে না। কিন্তু তাওহীদের তন্ময়ভাব সর্বক্ষণ প্রবল থাকে না; বরং বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় ইহা নিমিষেই বিলীন হইয়া যায়। তখন দৈহিক প্রকৃতির দাবি-দাওয়া এবং আন্তরিক প্রবৃত্তির প্রভাবে জাগতিক পূর্বসংস্কার আবার তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। অধিকাংশ কামিল ব্যক্তির অন্তরে কোন কোন সময় এরূপ তাওহীদভাব আসে। তাহাদের অন্তর হইতে যে ক্রোধের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা নহে; বরং সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে যে কাজ সম্পন্ন হইতেছে, ইহাতে সেই জীবের কোন স্বাধীন প্রবর্তনশক্তি নাই, এই বিশ্বাসে তাহাদের হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হয় না। তেমন ব্যক্তির প্রতি কেহ প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেও তাহার অন্তরে ক্রোধ জাগিয়া উঠে না।

গুরুতর কাজের চাপে লুক্কায়িত ক্রোধ—যাহাকে তাওহীদ ভাবাবেশ তন্ময় করে নাই, এমন ব্যক্তিও কোন গুরুতর কাজে নিবিষ্ট থাকিলে তাহার হৃদয়েও ক্রোধ জাগিয়া উঠে না; বরং লুক্কায়িত থাকে। হযরত সালমান রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে এক ব্যক্তি গালি দিল। তিনি তাহাকে বলিলেন- কিয়ামতের দিন আমার পাপের পাল্লা ভারী হইলে তুমি যাহা বলিতেছ আমি তদপেক্ষা মন্দ, কিন্তু পাপের পাল্লা হাল্‌কা

হইলে তোমার কথায় আমার কি ভয়?" হযরত রাবী' ইব্‌নে খায়সাম (র)-কে কেহ গালি দিলে তিনি বলিলেন- "বেহেশ্‌ত ও আমার মধ্যে এক দুর্গম গিরিপথ রহিয়াছে। আমি ইহা অতিক্রমে ব্যাপৃত আছি। অতিক্রম করিতে পারিলে আমি তোমার গালিকে ভয় করি না; কিন্তু অতিক্রম করিতে না পারিলে আমার দুর্দশার তুলনায় তোমার গালি অত্যন্ত কম।" এই দুই মহামনীষী পরকালের চিন্তায় এমন বিভোর ছিলেন যে, অপরের গালিতেও তাঁহাদের ক্রোধ জাগে নাই।

হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে এক ব্যক্তি গালি দিলে তিনি তাহাকে বলিলেন- "আমার অবস্থার যেটুকু তোমার অজ্ঞাত তাহা তুমি যাহা বলিতেছ তদপেক্ষা অধিক।" স্বীয় দোষ-ত্রুটি পর্যবেক্ষণে তিনি এত অধিক ব্যাপৃত ছিলেন যে, অপরের গালি শুনিয়াও তাঁহার ক্রোধ জন্মে নাই। হযরত মালিক ইব্‌নে দীনার (র)-কে এক রমণী কপট ধার্মিক বলিয়া সম্বোধন করিল। তিনি সেই রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "হে পুণ্যবতী, তুমি ভিন্ন আর কেহই আমাকে চিনিতে পারে নাই।" হযরত শা'বী (র)-কে এক ব্যক্তি নিন্দা করিতেছিল। তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন- "তুমি সত্য বলিয়া থাকিলে আল্লাহ্ যেন আমাকে মাফ করেন; আর তুমি মিথ্যা বলিয়া থাকিলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে মাফ করেন।" এই সকল দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কোন গুরুতর কাজ বা চিন্তায় মগ্ন থাকিলে ক্রোধ বশীভূত ও লুক্কায়িত থাকে।

আবার কেহ যদি বিশ্বাস করে, যে ব্যক্তি ক্রোধ করে না, আল্লাহ্ তাহাকে ভালবাসেন, তবে তাঁহার ভালবাসা লাভের লালসায় উত্তেজনা প্রবল কারণ দেখা দিলেও সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয় না। যেমন মনে কর, কেহ কোন রমণীর প্রতি প্রেমাসক্ত; কিন্তু সেই রমণীর সন্তান তাহাকে গালি দেয়। এমতাবস্থায়, যদি সে জানে যে, উক্ত সন্তানের গালি সহ্য করিলে প্রেমাস্পদ তাহাকে ভালবাসিবে, তবে সেই রমণীর প্রতি আসক্তি তাহাকে এইরূপ তন্ময় করিয়া তোলে যে সে তাহার সন্তান প্রদত্ত দুঃখ-কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করে এবং উক্ত সন্তানের কোনরূপ দুর্ব্যবহার তাহার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার করে না।

ক্রোধ দমনের উপায় বর্ণিত হইল। তন্মধ্যে যে কোনটি অবলম্বনে ক্রোধকে মারিয়া ফেলা আবশ্যক। অসম্ভব হইলে ইহাকে এত দুর্বল করিয়া ফেলিবে যেন উহা অবাধ্য না হয় এবং ধর্ম-বুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ না করে।

ক্রোধ বিনাশক ব্যবস্থা—ক্রোধ দমনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন ও সাধনা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, ক্রোধেই অধিকাংশ মানুষকে দোযখে লইয়া যায় এবং ইহা হইতেই জগতে অশান্তি, কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হয়। ক্রোধ দমনের দুইটি উপায় আছে। **প্রথম**- ক্রোধ বহিষ্কারক উপায়। ইহা জোলাপের মত ক্রোধরূপ ব্যাধির জড় ও

মূল অন্তর হইতে বাহির করিয়া দেয়। **দ্বিতীয়**- ক্রোধ উপশমমূলক উপায়। ইহা 'শিকাবীন' নামক অম্লরস ও মধু বা চিনি মিশ্রিত পানীয় সদৃশ। ইহা ব্যাধির তীব্র দোষসমূহ উপশম করে ও উগ্র স্বভাবকে সাম্যভাবাপন্ন করিয়া তোলে।

ক্রোধ বহিষ্কারক উপায়—সর্বাগ্রে ক্রোধ সঞ্চারের কারণ নির্ণয় করিবে এবং তৎপর ইহার মূলোচ্ছেদ করিবে। ইহাই ক্রোধ বহিষ্কারক উপায়। পাঁচটি কারণে ক্রোধের সঞ্চার হয়; যথা ঃ (১) অহঙ্কার, (২) ওজ্‌ব অর্থাৎ নিজে নিজকে উত্তম ও গুণবান বলিয়া মনে করা, (৩) কৌতুক, (৪) তিরস্কার এবং (৫) ধনলিপ্সা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা।

ক্রোধ-বহিষ্কারক উপায়ের প্রথম ধাপ—অহঙ্কার ক্রোধ সঞ্চারের অন্যতম প্রধান কারণ। অহঙ্কারী ব্যক্তি কথাবার্তা ও কাজকর্মের অপরের নিকট হইতে প্রত্যাশিত সম্মান না পাইলেই ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। অতএব বিনয়ী ব্যবহারে অহঙ্কার চূর্ণ করিতে হইবে। তোমার হৃদয়ে অহঙ্কার দেখা দিলে চিন্তা করিবে, তুমি আল্লাহ্‌র একটি নগণ্য দাসমাত্র; দাসের পক্ষে অহঙ্কার শোভা পায় না। আরও বুঝিবে যে, সৎস্বভাবেই দাসত্ব হইয়া থাকে; অহঙ্কার অসৎস্বভাবের অন্তর্গত। সুতরাং অহঙ্কার দাসত্বের দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায়। বিনয় ব্যতীত অন্য কিছুতেই অহঙ্কার বিনাশ করা যায় না।

ক্রোধ-বহিষ্কারক উপায়ের দ্বিতীয় ধাপ--ক্রোধ সঞ্চারের দ্বিতীয় কারণ খোদপছন্দী বা নিজে নিজকে উত্তম ও গুণবান বলিয়া মনে করা। ইহা বিদূরিত করিতে হইলে স্বীয় পরিচয় লাভ করিবে। অহঙ্কার ও খোদপছন্দী দূর করিবার উপায় যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

ক্রোধ-বহিষ্কারক উপায়ের তৃতীয় ধাপ—ক্রোধ সঞ্চারের তৃতীয় কারণ কৌতুক। কাহাকেও কৌতুক করিলে অধিকাংশ সময় সেই ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। সুতরাং এইরূপ অপকর্মে সময়ের অপচয় না করিয়া বরং আখিরাতের সম্বল সংগ্রহ কার্যে ও সৎস্বভাব অর্জনে নিজকে ব্যাপৃত রাখিবে এবং কৌতুক হইতে বিরত থাকিবে। কৌতুকের ন্যায় উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও ক্রোধ জন্মে। তুমি কাহাকেও উপহাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলে সে-ও তোমাকে তদ্রূপ করিবে। এইরূপে তোমার নিজের সম্মান নিজেই নষ্ট করিবে। অতএব এইরূপ কৌতুক, উপহাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হইতে নিরস্ত থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ক্রোধ-বহিষ্কারক উপায়ের চতুর্থ ধাপ—কাহাকেও তিরস্কার করিলে তিরস্কারকারী ও তিরস্কৃত ব্যক্তি এই উভয়ের হৃদয়েই ক্রোধের উদ্রেক হয়। ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় এই মনে করিবে, নিজে দোষমুক্ত না হইয়া অপরের দোষ ধরিয়া তিরস্কার করা শোভা পায় না। অপরপক্ষে, দোষমুক্ত ব্যক্তিই বা অপরকে

তিরস্কার করিয়া নিজেকে কলঙ্কিত করিবে কেন? অতএব তিরস্কার করা কাহারও পক্ষে সঙ্গত নহে।

ক্রোধ বহিষ্কারক উপায়ের পঞ্চম ধাপ—যদিও সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে অধিকাংশ স্থলেই মানবের ধন, প্রভুত্ব ও মান-সম্ভ্রমের দরকার হইয়া পড়ে, তথাপি ধন-লিপ্সা ও প্রভুত্বপ্রিয়তাই ক্রোধ উৎপত্তির অন্যতম কারণ। কৃপণের নিকট হইতে এক কপর্দক গ্রহণ করিলেও সে ক্রুদ্ধ হয়, আর অতি লোভীর নিকট হইতে এক গ্রাস অন্ন লইলেও সে ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব কামনা মন্দ স্বভাবের অন্তর্গত এবং ক্রোধের মূল কারণ। ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব কামনা দমনের জ্ঞানমূলক ও অনুষ্ঠানমূলক উপায় রহিয়াছে।

জ্ঞানমূলক উপায়—ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব কামনার আপদ, কদর্যতা এবং ইহ-পরকালে ইহাদের অনিষ্ট সাধন সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করত ইহাদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণার উদ্রেক করিবে।

অনুষ্ঠানমূলক উপায়—উক্ত প্রবৃত্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে; ইহারা যে বিষয়ে তোমাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করে, ইহা হইতে তুমি বিরত থাকিবে। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে যে শুধু ধনাসক্তি ও প্রভুত্বপ্রিয়তা নিবৃত্ত হয় তাহাই নহে, বরং ইহা সকল প্রকার কুস্বভাব নিবারণের উপায়। 'রিয়াযত' বিষয় বর্ণনাকালে প্রথম অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

ক্রোধান্ধ ব্যক্তির সংসর্গে ক্রোধ সঞ্চার—মানব অন্তরে ক্রোধ বদ্ধমূল হওয়ার অপর একটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। যাহারা ক্রোধকে মহিমা ও বীরত্বের কারণ বলিয়া মনে করে এবং ইহাতে গর্ব অনুভব করে, এইরূপ ক্রোধান্ধ লোকের সংসর্গে যাহারা প্রতিপালিত হয় তাহাদের অন্তরে ক্রোধরূপ ব্যাধি সংক্রামিত হয় এবং পরিশেষে ইহা তাহাদিগকে চির রুগ্ন করিয়া ফেলে। ক্রোধান্ধ ব্যক্তিগণ ক্রোধের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলে- "অমুক সাধু পুরুষ এক কথায় এক ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, অমুকের জানমাল ধ্বংস করিয়াছেন, কাহার সাধ্য যে, তাঁহার কথার প্রতিবাদ করে। সিংহপুরুষ বটে, যে কেহ তাঁহার রোষে পতিত হইয়াছে সেই ধ্বংস হইয়াছে। সিংহপুরুষ এইরূপই হইয়া থাকেন; কাহাকেও ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াকে তাঁহারা অপমান, অক্ষমতা ও অনুপযুক্ততার কারণ বলিয়া মনে করেন।" ক্রোধান্ধ ব্যক্তিগণের মুখে ক্রোধের এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাদের নব সঙ্গিগণের অন্তরেও পরিশেষে ক্রোধ বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

ক্রোধ কুকুরের স্বভাব। কিন্তু ক্রোধান্ধগণ ইহাকে বীরত্ব ও বাহাদুরির কারণ বলিয়া মনে করে। মানবের প্রশংসনীয় গুণাবলী, যাহা পয়গম্বরগণের স্বভাব, যেমন সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, ক্ষমা প্রভৃতিকে তাহার অনুপযুক্ততা ও কাপুরুষতার লক্ষণ বলিয়া

থাকে। ইহাই শয়তানের কাজ। সে প্রতারণা দ্বারা প্রশংসনীয় গুণের কুৎস রটনা করত মানুষকে সৎস্বভাব অর্জনে বিরত রাখে এবং জঘণ্য দোষের গুণকীর্তন করত অসৎস্বভাবের দিকে তাহাকে আহ্বান করে। জ্ঞানীগণ জানেন, ক্রোধের সহিত বীরত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহা হইলে অবলা নারী, অসহায় শিশু, দুর্বল বৃদ্ধ এবং রুগ্ন ব্যক্তির কখনও ক্রোধের সঞ্চার হইত না। কিন্তু ইহা অবিদিত নহে যে, তাহারা তাড়াতাড়ি উত্তেজিত হইয়া থাকে। ক্রোধ বিজয়ীগণের ন্যায় বীরপুরুষ আর নাই। নবী ও কামিল দরবেশগণই সেই বীরত্বের অধিকারী। পাহলোয়ান, তুর্কী সিপাহীগণ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি প্রাণীর হিংস্র বলে বলীয়ান হইলেও ক্রোধ দমন ক্ষেত্রে তাহাদের কোনই বীরত্ব নাই।

প্রিয় পাঠক, এখন ভাবিয়া দেখ, নবী ও দরবেশগণের গুণে ভূষিত হওয়া তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয়, না নির্বোধ অজ্ঞদের ন্যায় হওয়া সঙ্গত।

ক্রোধ-উপশমমূলক উপায়—ক্রোধের মূল কারণসমূহ উৎপাটনের জন্য উল্লিখিত ব্যবস্থা জোলাপ সদৃশ। উহা অবলম্বনেও ক্রোধের মূলোৎপাটন করিতে না পারিলে ক্রোধ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেই তৎক্ষণাত শান্ত করা আবশ্যক। এইজন্য এক প্রকার মবরাম্ল শরবত তাহাকে পান করিতে হইবে। ইহা নম্রতার মাধুর্য ও সহিষ্ণুতার অম্লত্বের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর ইলম ও আমলের সহযোগে একই মাজন প্রস্তুত করিলে, ইহা সকল কুস্বভাবের মহৌষধ হইয়া থাকে।

ক্রোধ-প্রতিষেধকরূপে ইলম—ক্রোধের অনিষ্টকারিতা ও ইহা নিবারণের সওয়াব সম্পর্কে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের উক্তিসমূহ বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে। ইহাই ক্রোধ প্রতিষেধক জ্ঞানমূলক উপায়। এইরূপ কতিপয় উক্তি উপরে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর ভাবিবে, অন্যের উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা রহিয়াছে, এই তুলনায় তোমার উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা অনন্ত ও অসীম। তুমি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া অপরের কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিবে? আল্লাহ্‌ত তোমার ক্ষতি অনায়াসে অতি সহজে করিতে পারেন। অদ্য তুমি কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র ক্রোধ হইতে তুমি কিরূপে রক্ষা পাইবে?

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ভৃত্যকে কোন কাজ উপলক্ষে পাঠাইলেন। ভৃত্য অত্যন্ত বিলম্বে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন- "শেষ বিচার দিবস না থাকিলে আমি তোমাকে প্রহার করিতাম।" ইহা বলিবার পরই তিনি নিজকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন- "তোমার কাজটি যেরূপে সম্পন্ন করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, ঠিক সেইরূপে সম্পন্ন হইয়াছে; তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী হয় নাই, ইহাই কি তোমার ক্রোধের কারণ? তাহা হইলে ত আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ঝগড়া করা হইল!"

প্রিয় পাঠক, উল্লিখিত পারলৌকিক কারণেও ক্রোধ দমন না হইলে স্বয়ং সাংসারিক যুক্তি অবলম্বনে মনে মনে চিন্তা করিবে; তুমি উত্তেজিত হইলে প্রতিপক্ষও উত্তেজিত হইয়া তোমা হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে। শত্রুকে অবহেলা করা সমীচীন নহে। আরও মনে কর, কোন দাস বা দাসী ঠিকভাবে কর্তব্য পালন করে না, আবার কখন কখনও পলায়ন করে। ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলে সে ছলনা ও প্রতারণা করিতে পারে। আর ক্রোধের সময় মানুষ কিরূপ জঘণ্য মূর্তি ধারণ করে, ইহাও একবার স্মরণ কর। তখন তাহার বাহ্য আকার পরিবর্তিত হইয়া কুশ্রী ও কদর্য হইয়া পড়ে। সেই মূর্তি দর্শনে মনে হয় যেন, উত্তেজিত ব্যাঘ্র কোন জন্তুকে আক্রমণের উপক্রম করিয়াছে। ক্রোধের সময় মানুষের বাহ্য আকারে যেরূপ পরিবর্তন দেখা যায়, তাহার আন্তরিক অবস্থারও তদ্রূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। তখন মনে হয় যেন তাহার ভিতরে আগুন জ্বলিতেছে। ক্রোধের সময় সে ক্ষুধিত কুকুরের ন্যায় হইয়া থাকে।

কেহ ক্রোধ দমন করিতে চাহিলে অধিকাংশ সময় শয়তান তাহাকে প্ররোচণা দিয়া বলে- "ক্রোধ দমন করিলে তোমার দুর্বলতা প্রকাশ পাইবে, অপমান হইবে, প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইবে এবং লোকচক্ষে তুমি হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।" তখন শয়তানকে এইরূপ উত্তর দিয়া নিরস্ত করিবে- "নবীগণের (আ) সৎস্বভাব অর্জন এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভে সমর্থ হইলে যে সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়, সংসারে তদপেক্ষা অধিক সম্মানের আর কিছুই হইতে পারে না। কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হওয়ার ফলে কল্য কিয়ামতের দিন হেয় ও তুচ্ছ হওয়া অপেক্ষা অদ্য ক্ষণস্থায়ী সংসারে হেয় ও তুচ্ছ হওয়া আমার পক্ষে উত্তম।"

ক্রোধ প্রতিষেধক জ্ঞানমূলক উপায় বর্ণনা করিতে যাইয়া উপরে কতিপয় উপমার অবতারণা করা হইল। তদ্রূপ আরও দৃষ্টান্ত তোমরা নিজে নিজেই বুঝিয়া লইবে।

ক্রোধ প্রতিষেধক আমল– ক্রোধের সময় বলিবে-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অর্থাৎ "বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" তুমি দণ্ডায়মান থাকিলে বসিয়া পড়িবে, আর বসিয়া থাকিলে শয়ন করিবে। ইহা সুন্নত। ইহাতেও ক্রোধ দমন না হইলে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওযু করিবে। কেননা, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "ক্রোধ আগুন হইতে জন্মে, পানিতে ইহা দমন হয়।" হাদীস শরীফে উক্ত আছে- "(ক্রোধের সময়) কপাল মাটিতে রাখিয়া সিজদা করিবে এবং মনে করিবে যে, তুমি মাটি হইতে সৃষ্ট, আল্লাহ্‌র নগণ্য দাস।

(মাটি হইতে সৃষ্ট দাসকে মাটির ন্যায় সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক)। এইরূপ দাসের পক্ষে ক্রোধ শোভা পায় না।"

একদা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু ক্রুদ্ধ হইলে নাকে দিবার জন্য পানি চাহিয়া বলিলেন- "ক্রোধ শয়তান হইতে আসে, নাকে পানি দিলে চলিয়া যায়।" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু একদা এক ব্যক্তিকে বলিলেন- "ইয়া ইব্নাল হামরা"। অর্থাৎ হে লোহিত জননীর পুত্র। এইরূপ আহ্বানে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, ঐ ব্যক্তি দাসীর পুত্র। তৎপর রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "হে আবূ যর, আমি শুনিলাম, তুমি অদ্য এক ব্যক্তিকে তাহার মাতার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া দোষারোপ করিয়াছ। হে আবূ যর, জানিয়া রাখ, পরহেযগারীতে অধিক না হইলে তুমি কোন কৃষ্ণ বা লোহিত মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নও।" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু ইহা শুনিয়া ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। সেই ব্যক্তি সহাস্য বদনে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সালাম দিলেন।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা ক্রুদ্ধ হইলে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার নাসিকা মুবারক ধারণপূর্বক বলিতেন- "হে আয়েশা, বল-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ـ اِغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ ـ

অর্থাৎ "হে খোদা, আমার নবী মুহাম্মদ (সা) এবং প্রভূ, আমার গোনাহ্ মা'ফ কর, অন্তরের ক্রোধ দূর করিয়া দাও এবং আমাকে পথ-ভ্রান্তির বিপদাপদ হইতে রক্ষা কর।" ক্রোধের সময় এই দোয়া পাঠ করাও সুন্নত।

অপ্রিয় বাক্য শ্রবণকারীর কর্তব্য—কাহারও অত্যাচার বা অপ্রিয় বাক্যের উত্তর না দিয়া নীরব থাকাই উত্তম। কিন্তু এইরূপ স্থলে নীরব থাকা ওয়াজিব নহে। কিন্তু প্রত্যেক কথার জওয়াব দিবারও অনুমতি নাই। গালির পরিবর্তে গালি দেওয়া এবং গীবতের পরিবর্তে গীবত করা জায়েয নহে। কেননা, এই সমস্ত কারণে শরীয়তের শাস্তি বিধান অপরাধীর উপর ওয়াজিব হইয়া পড়ে। কিন্তু কটু বাক্যের উত্তরে এমন কটুবাক্য বলার অনুমতি আছে যাহাতে মিথ্যার লেশমাত্রও নাই। ইহা কেছাছ সদৃশ্য। (অপরাধ প্রবণতা নিবারণের উদ্দেশ্যে তুল্য পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ ও যথাবিহিত শাস্তির বিধানকে কেছাছ বলে)।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে দোষ তোমার মধ্যে আছে ইহার উল্লেখ করিয়া তোমাকে কেহ গালি দিলে তাহার দোষ উল্লেখ করত উত্তর

দিও না।" কিন্তু এই হাদীসের নির্দেশ অনুসারে গালি বা ব্যভিচার সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ না হইলে ঐ ব্যক্তির উত্তর না দিয়া বিরত থাকা ওয়াজিব নহে। ইহার প্রমাণ এই যে, রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-

اَلْمُسْتَبَّانُ مَاقَالَا فَعَلَى الْبَادِيْ حَتّٰى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُوْمُ ـ

অর্থাৎ "পরস্পর ঝগড়ার সময় যাহা বলা হইয়া থাকে ইহার পাপ অত্যাচারিত ব্যক্তি সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত আরম্ভকারীর উপর থাকে।"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন- "রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে অধিক ভালবাসেন এবং আমার প্রতি তাঁহার আসক্তি অত্যধিক বলিয়া আমার সপত্নীগণ হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্হাকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিয়া বলিয়া পাঠান যেন তিনি সকলকে তুল্যরূপে ভালবাসেন। হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্হা আসিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন। তিনি জাগ্রত হইলে হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্হা তাঁহাকে নিবেদন জানাইলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবার বলিলেন- 'আমি আয়েশাকে অত্যন্ত ভালবাসি, তোমরাও তাহাকে তদ্রূপ ভালবাস।' হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্হা প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার সপত্নীদিগকে সমস্ত কথা জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। আমার অপর সপত্নী হযরত যয়নব রাযিয়াল্লাহু আন্হাকে সকলে মিলিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহাকে হযরত আমার সমান ভালবাসিতেন বলিয়া তিনি দাবি করিতেন। তিনি (হযরত যয়নব) আসিয়াই অপ্রিয় বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন- 'আবূ বকরের কন্যা এইরূপ, আবূ বকরের কন্যা ঐরূপ।' আমি চুপ ছিলাম। তৎপর রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিবার জন্য আমাকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি লাভ করিয়া আমিও ঐ প্রকার অপ্রিয় বাক্যে জওয়াব দিতে লাগিলাম। জওয়াব দিতে আমার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। অনন্তর তিনি (হযরত যয়নব) পরাজিত হইলেন। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন বলিলেন- "হে যয়নব, তিনিই আবূ বকরের কন্যা।" অর্থাৎ তর্ক-বিতর্কে তুমি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না।

উল্লিখিত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা না হইয়া সত্য হইলে অপ্রিয় কথায় উত্তর দিবার অনুমতি আছে; যেমন- হে নির্বোধ, হে জাহিল, লজ্জা কর, নীরব থাক, প্রভৃতি। এইরূপ বাক্য কটু হইলেও অসত্য নহে। কারণ, কেহই একেবারে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাশূন্য হইতে পারে না। কিন্তু অশ্লীল কথা যেন রসনা হইতে বাহির না হয় তজ্জন্য ক্রোধের সময় বিশেষ প্রয়োজন হইলে এমন কথা বলিবার অভ্যাস করিবে যাহা নিতান্ত জঘন্য নহে; যেমন হতভাগ্য, অপদার্থ, অসভ্য, গাধা ইত্যাদি।

তবে ঝগড়া-বিবাদকালে উত্তর দিলে ন্যায়ের গণ্ডির ভিতর থাকা নিতান্ত দুষ্কর। এইজন্য উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে লাগিল। কিন্তু তিনি নীরব ছিলেন। তিনি অবশেষে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলে রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হযরত আবূ বকর (রা) নিবেদন করিলেন– "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এতক্ষণ ত আপনি বসিয়া ছিলেন, কিন্তু আমি উত্তর দিতে আরম্ভ করিতেই আপনি গাত্রোত্থান করিলেন?" তিনি বলিলেন– "তুমি নীরব থাকা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তোমার পক্ষ হইতে জওয়াব দিতেছিল। (তুমি জওয়াব দিতে আরম্ভ করিলে) শয়তান আগমন করিল। শয়তানের সহিত উপবেশন করাকে আমি ঘৃণা করি।"রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আল্লাহ্ বিভিন্ন ধাতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। কতক লোক এরূপ যে, তাহারা বিলম্বে ক্রুদ্ধ হয় ও বিলম্বে শান্ত হয়, কতক লোক ইহার বিপরীত, তাড়াতাড়ি ক্ষুদ্ধ হয় এবং তাড়াতাড়ি শান্ত হয়। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে বিলম্বে ক্ষুদ্ধ হয় এবং তাড়াতাড়ি শান্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যে তাড়াতাড়ি ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু বিলম্বে শান্ত হইয়া থাকে।"

গুপ্ত ক্রোধের আপদ—ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সততার বশবর্তী হইয়া বিরাগভাজন ব্যক্তিকে ক্ষমা করত ক্রোধ দমন করিলে তুমি পরম ভাগ্যবান। কিন্তু ক্ষমতার কারণে বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্রোধ চাপা রাখিলে ইহা তোমার অন্তরে বিকৃত হইয়া দ্বেষ-বিদ্বেষের সৃষ্টি করিবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– اَلْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُوْدٍ অর্থাৎ "মুমিন কখনও বিদ্বেষপরায়ণ হইতে পারে না।" দ্বেষ-বিদ্বেষ ক্রোধের পুত্রস্বরূপ। দ্বেষ-বিদ্বেষ হইতে আবার আট প্রকার ধর্ম ধ্বংসকর মনোভাব জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগকে ক্রোধের পৌত্র বলা যাইতে পারে।

বিদ্বেষজাত মনোভাব—বিদ্বেষজাত মনোভাব আট প্রকার। প্রথম– ঈর্ষা। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি সুখে যাতনা ও দুঃখে আনন্দ পায়। দ্বিতীয়– শামাতাত অর্থাৎ অপরের দুঃখ ও বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা। (ঈর্ষার মত ইহা আন্তরিক লুক্কায়িত ভাব নহে; ইহা কথাবার্তায় ও ক্রিয়াকলাপে প্রকাশিত হয়)। তৃতীয়– বিমুখতা অর্থাৎ বিরাগভাজন ব্যক্তির প্রতি অপ্রসন্ন থাকা। তাহার সহিত কথা না বলা; এমন কি সালামের জওয়াবও না দেওয়া। চতুর্থ– অবজ্ঞা। ইহাতে মানুষ বিরাগভাজন ব্যক্তিকে হেয় ও তুচ্ছ বলিয়া মনে করে। পঞ্চম– বিরাগভাজন ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা বাহিরে প্রকাশ পায় এবং লোক বিরাগভাজন ব্যক্তির কুৎসা, নিন্দা ও গুপ্ত দোষ প্রকাশে পঞ্চমুখ হয় এবং তৎপ্রতি নানারূপ মিথ্যা ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। ষষ্ঠ– বিরাগভাজন ব্যক্তির দোষ বিদ্বেষ-পরায়ণ ব্যক্তি লোকসমাজে প্রকাশ করে, ইহা

লইয়া সমালোচনা করে এবং তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। **সপ্তম**– বিরাগভাজন ব্যক্তির প্রাপ্য আদায় ও তাহার নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধে অবহেলা দেখা দেয়; তাহার সহিত আত্মীয়তা ছেদন করা হয় এবং তাহার কোন হক নষ্ট হইয়া থাকিলে ইহা প্রত্যর্পণ করা হয় না বা ক্ষমাও চাওয়া হয় না। **অষ্টম**– বিরাগভাজন ব্যক্তিকে যাতনা প্রদান, এমন কি সুযোগ পাইলে তাহাকে হত্যার বাসনা বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির অন্তরে জাগিয়া উঠে এবং সে অপরকেও তাহার বিরুদ্ধে তদ্রূপ কার্যে উত্তেজিত করিয়া তোলে।

ক্রোধজনিত মানসিক পরিবর্তন—ক্রোধের ফলে বিরাগভাজন ব্যক্তির প্রতি সাধু এবং নিষ্পাপ ব্যক্তিরও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। বিরাগভাজন ব্যক্তির উপকার, কাজকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা ও তাহার সহিত নম্র ব্যবহার আর পূর্বের ন্যায় করা হয় না। এমন কি তাহার সহিত একত্রে উপবেশন করত আল্লাহ্‌র যিকির এবং তাহার কল্যাণের জন্য দোয়া করিতেও মন লাগে না। এই সকল কারণে ক্রোধের বশীভূত হইলে সাধু পুরুষদেরও মরতবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাদের বিস্তর ক্ষতি সাধিত হয়।

হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মিস্‌তাহ্ নাম জনৈক নিকট-আত্মীয়পোষ্য ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদে যোগদান করিলে হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার ভরণ-পোষণ রহিত করিয়া শপথ করেন যে, তাঁহাকে আর কখনও জীবিকা প্রদান করিবেন না। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اِلَى قَوْلِهِ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ -

অর্থাৎ "এবং যেন শপথ না করে তোমাদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই বিষয়ে যে, দিবে না স্বজন ও দরিদ্র এবং আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগী লোকদিগকে এবং উচিত যে, ক্ষমা করে ও দোষ ছাড়িয়া দেয়। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন ইহা কি তোমরা চাও না?" (সূরা নূর, রুকু ৩, পারা ১৮)। ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "আল্লাহ্‌র শপথ, আমি অবশ্যই ইহা ভালবাসি।" তৎপর তিনি আবার মিস্‌তাহ্‌র ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন।

বিদ্বেষের তারতম্য অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ—বিদ্বেষভাবের তারতম্য অনুসারে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

প্রথম শ্রেণী—সিদ্দীকগণ। তাঁহাদের মনে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ জাগরিত হইলে কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমে তাঁহারা ইহার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিরাগভাজন ব্যক্তির উপকার করেন এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতার সহিত তাহার সঙ্গে মিলিত হন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—পরহেযগারগণ। তাঁহারা বিরাগভাজন ব্যক্তির ইষ্ট ও অনিষ্ট কিছুই করেন না। অর্থাৎ বিদ্বেষভাব তাঁহাদের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।

তৃতীয় শ্রেণী—ফাসিক যালিম। তাহারা বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

ক্ষমার ফযীলত—কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তুমি তাহার উপকার কর। ইহাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রকৃষ্টতম উপায়। ইহা সম্ভবপর না হইলে অন্ততঃপক্ষে তাহাকে ক্ষমা কর, কেননা, ক্ষমার ফযীলত অত্যন্ত বেশী।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "তিনটি বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি; (উহা এই যে) (১) সদ্‌কা দিলে ধন কমে না, তোমরা সদ্‌কা দাও। (২) যে ব্যক্তি অপরের অপরাধ মা'ফ করে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাহাকে অধিক মর্যাদা দান করিবেন। (৩) যে ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য দরিদ্রতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন– "যাহারা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অন্যায় করিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই; কিন্তু আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কেহ অন্যায় করিলে তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা থাকিত না। তাঁহার ইচ্ছাধীন কার্যের মধ্যে যাহা মানবজাতির জন্য অধিক সহজ দেখিতেন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কখনও তিনি পাপকার্য অবলম্বন করিতেন না।"

হযরত আকাবা ইব্‌ন আমের রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন– 'সংসারী লোক ও আখিরাতের পথিক, উভয়ের জন্য যে-ভাব উত্তম, তাহা তোমাকে জানাইয়া দিতেছি। তোমার সহিত কেহ সম্বন্ধ কর্তন করিতে চাহিলে তুমি তাহার সঙ্গে মিলিত হও; তোমাকে কেহ বঞ্চিত করিলে তুমি তাহাকে দান কর।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলেন– ' হে আল্লাহ্, তোমার বান্দাগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমার অধিক প্রিয়?' উত্তর হইল– 'শাস্তি দানের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি শত্রুকে মা'ফ করে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি অত্যাচারীর উপর অভিশাপ দিল সে তাহার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিল।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কুরায়শ জাতিকে পরাজিত করিয়া পবিত্র মক্কা শরীফ দখল করিলে কুরায়শগণ তাঁহার প্রতি নিজেদের অবিচার, অত্যাচার স্মরণ করিয়া নিতান্ত ভীত ও জীবনে নিরাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু রাসূলে

মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কা'বা শরীফের দ্বারদেশে স্বীয় পবিত্র হস্ত স্থাপনপূর্বক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– "আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়; তাঁহার শরীক নাই। তিনি অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করিলেন ও স্বীয় বান্দাগণকে জয়ী করিলেন এবং স্বীয় দুশ্‌মনদিগকে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিলেন। (হে কুরায়শগণ) অদ্য তোমরা কী দেখিতেছ এবং কী বলিতেছ?" কুরায়শগণ একবাক্যে নিবেদন করিল– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আজ সকল ক্ষমতাই আপনার করতলগত, ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত আমাদের আর কী বলিবার আছে? আমরা আপনার দয়াপ্রার্থী।" তাহাদের কথা শুনিয়া রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "আমার ভাই ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম স্বীয় ভ্রাতাগণের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন আমিও তাহাই বলিতেছি ঃ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ "আজ তোমাদের উপর ভৎসনা করিবার কিছুই নাই।" ইহা বলিয়া তিনি কুরায়শদিগকে জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করিলেন।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "কিয়ামতের দিন সমস্ত লোক উত্থিত হইলে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে– 'যাহাদের পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে, তাহারা উঠ।' কয়েক সহস্র লোক উঠিবে এবং বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবে। কারণ, তাহারা (দুনিয়াতে) আল্লাহ্‌র বান্দাদের অপরাধ মা'ফ করিয়া দিত।" হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ কর, তাহা হইলে প্রচুর অবসর পাইবে। আবার অবসরকালে প্রতিশোধ গ্রহণের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও (শত্রুকে) ক্ষমা কর।"

খলীফা হিশামের (র) নিকট এক অপরাধীকে আনয়ন করা হইলে প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সে স্বীয় দোষ প্রক্ষালনের উদ্দেশ্যে যুক্তি-প্রমাণাদি প্রদর্শন করিতে লাগিল। খলীফা বলিলেন– "তুমি আমার সম্মুখে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিতে আরম্ভ করিলে?" অপরাধী কুরআন শরীফের এই আয়াত আবৃত্তি করিল ঃ يَوْمَ تَأْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا অর্থাৎ "হাশরের মাঠে (আল্লাহ্‌র সম্মুখে) সমস্ত প্রাণী আনয়ন করা হইবে; তাহারা নিজ নিজ জীবনের জন্য তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিবে।" সে আরও বলিল– "কিয়ামত দিবস মহাবিচারক আল্লাহ্‌র সম্মুখে জবাবদিহিকালে ত বান্দা প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিতে পারিবে; এমতাবস্থায়, আমি আপনার সম্মুখে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিতে পারিব না কেন?" খলীফা হিশাম (র) বলিলেন– "বেশ এস, কি বলিতে চাও বল।"

হযরত ইব্‌ন মাস্‌উদ রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হুর একটি দ্রব্য চোরে লইয়া গেল। সমবেত লোকগণ চোরকে অভিশাপ দিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে অভিশাপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন– "হে খোদা, চোর কোন অভাবের তাড়নায় দ্রব্যটি চুরি করিয়া

থাকিলে তাহার মঙ্গল কর; কিন্তু পাপ কার্যে সাহস বর্ধন নিমিত্ত চুরি করিয়া থাকিলে ইহাই যেন তাহার শেষ পাপ বলিয়া লিখিত হয়।" অর্থাৎ তৎপর যেন সেই ব্যক্তি আর পাপ না করে।

হযরত ফুযায়ল (র) বলেন– "চোরে এক ব্যক্তির ধন চুরি করিয়া লইয়া গেল। কা'বা শরীফ তওয়াফকালে দেখিতে পাইলাম, তিনি কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম– 'হে মহাত্মন! আপনি কি অপহৃত ধনের জন্য কাঁদিতেছেন?' তিনি বলিলেন– 'না, বরং আমি যেন দেখিতেছি, হাশরের মাঠে ঐ ব্যক্তি আমার সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কিন্তু সে ঐ চুরি কার্যের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিতেছে না। এইজন্য দুঃখিত হইয়া আমি কাঁদিতেছি।" খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নিকট কতিপয় যুদ্ধবন্দীকে আনয়ন করা হইল। তখন একজন বুযুর্গ তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– "তুমি যাহা চাহিলে, আল্লাহ্ তোমাকে তাহা দান করিয়াছেন, অর্থাৎ তোমাকে বিজয়ী করিয়াছেন। এখন আল্লাহ্ যাহা চাহেন, তাহা তুমি দাও, অর্থাৎ তাহাদিগকে ক্ষমা কর।" ইহা শুনিয়া খলীফা সকল বন্দীকে মা'ফ করিয়া দিলেন। ইন্‌জীল কিতাবে আছে– 'যে-ব্যক্তি নিজ নির্যাতকের অপরাধ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে তাহার নিকট শয়তান পরাজিত হয়।" অর্থাৎ শয়তান তাহাকে পাপকর্মে প্ররোচিত করিতে সমর্থ হয় না।

মোটকথা, ক্রোধভাজন ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া উচিত এবং প্রত্যেক কাজে নম্রতা অবলম্বন করা কর্তব্য। তাহা হইলে মানব-মনে ক্রোধের সঞ্চার হইতে পারে না।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যাহাকে আল্লাহ্ নম্রতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান করিয়াছেন। আর যাহাকে তিনি নম্রতাগুণে বঞ্চিত করিয়াছেন, সে ইহ-পরকালের মঙ্গল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।" তিনি অন্যত্র বলেন– "আল্লাহ্ সদয় সহনশীল এবং সদয় সহনশীল ব্যক্তিকে তিনি ভালবাসেন। তিনি সদয় সহনশীলতার জন্য যাহা দান করেন, কঠোরতা প্রদর্শন করিলে তাহা দান করেন না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে বলেন– "প্রত্যেক কাজে নম্রতার দিকে দৃষ্টি রাখিবে; কেননা নম্রতাযোগে যে কাজ করা হয় তাহা সম্পন্ন হয়, আর যে কাজে নম্রতা থাকে না তাহা নষ্ট হয়।"

ঈর্ষা ও ইহার আপদ—ক্রোধ হইতে বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষ হইতে ঈর্ষা জন্মে। ঈর্ষা নিতান্ত অনিষ্টকর দোষসমূহের অন্যতম।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আগুন যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বালাইয়া দেয়, ঈর্ষাও তদ্রূপ নেকীসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলে।" তিনি আরও বলেন– "কেহই তিনটি বিষয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না; (উহা এই) (১) বদগুমান (কুধারণা), (২) ঈর্ষা ও (৩) মন্দ ফাল (অর্থাৎ শুভাশুভ লক্ষণ-বিচার, যেমন শূণ্য কলসী, শিয়াল-কুকুরের ডাক, হাঁচি, টিকটিকি প্রভৃতিকে কুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করা)। আমি তোমাদিগকে উহার প্রতিষেধক জানাইয়া দিতেছি; (তোমাদের মনে কাহারও সম্বন্ধে) বদগুমান হইলে মনে মনে ইহার সত্যতা অনুসন্ধানে লিপ্ত হইও না এবং অন্তরে ইহা পুষিয়া রাখিও না। মন্দ ফাল দেখিলে বিশ্বাস করিও না। ঈর্ষার উদ্রেক হইলে ইহার বশীভূত হইয়া হস্ত ও রসনা সঞ্চালন করিও না।" তিনি আরও বলেন– "হে মুসলমানগণ, যে বস্তু তোমাদের অগ্রগামী বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছে, তাহা তোমাদের মধ্যে উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। উহা ঈর্ষা ও শত্রুতা। যে আল্লাহ্‌র হাতে মুহাম্মদের (সা) প্রাণ, তাঁহার শপথ, ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না; আর তোমরা যে পর্যন্ত পরস্পরকে ভালবাসিবে না সেই পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হইতে পারিবে না। আর ভালবাসা কি উপায়ে লাভ করা যায়, তোমাদিগকে জানাইয়া দিতেছি– তোমরা পরস্পরকে প্রকাশ্যে সালাম দিতে থাক।"

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এক ব্যক্তিকে আরশের ছায়াতলে দেখিয়া মনে করিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র নিকট উচ্চ মরতবার অধিকারী। তাঁহার সেই মরতবা লাভের ইচ্ছা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– "হে খোদা, এই ব্যক্তি কে এবং তাঁহার নাম কি?" আল্লাহ্ তাঁহার নাম ব্যক্ত না করিয়া তাঁহার কার্যকলাপের সংবাদ দিয়া বলিলেন– "এই ব্যক্তি কখনও ঈর্ষা করে নাই, মাতাপিতার নাফরমানি করে নাই এবং একের কথা অপরের কানে লাগায় নাই।" হযরত যাকারিয়্যা আলায়হিস্ সালাম বলেন যে, আল্লাহ্ বলেন– "ঈর্ষী ব্যক্তি আমার নিআমতের শত্রু এবং আমার বিধানের উপর বিরক্ত ও আমার বান্দাগণের মধ্যে আমি যেভাবে (আমার নিআমত) বন্টন করিয়া দিয়াছি, সে উহা পছন্দ করে না।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "ছয় প্রকার পাপের ফলে ছয় শ্রেণীর লোক বিনা বিচারে দোযখে যাইবে; (তাহা এই) (১) শাসনকর্তা– অত্যাচারের জন্য; (২) আরববাসী– অন্যায় পক্ষপাতিত্বের জন্য; (৩) ধনবান ব্যক্তি– অহঙ্কারের জন্য; (৪) বণিক– খিয়ানত অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাতের জন্য; (৫) গ্রাম্য গঁওয়ার লোক– অজ্ঞানতা ও মূর্খতার জন্য এবং (৬) আলিম ব্যক্তি– ঈর্ষার জন্য।" হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "একদা আমরা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলিলেন– 'বেহেশতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত একজন এখন আসিতেছে।' আন্‌সার সম্প্রদায়ের

অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাম হস্তে পাদুকা ঝুলিতেছিল এবং তাঁহার দাঁড়ি হইতে ফোঁটা-ফোঁটা ওযুর পানি পড়িতেছিল। দ্বিতীয় দিনও হযরত (সা) এই কথাই বলিলেন, আর ঐ ব্যক্তিই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমাগত তিন দিবস এরূপ ঘটনাই ঘটিল। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস সেই আনসারীর কার্য-কলাপ কিরূপ, জানিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন। তিনি তাঁহার গৃহে যাইয়া বলিলেন– 'আমি আমার পিতার সহিত ঝগড়া করিয়াছি। আপনার গৃহে তিন রাত্রি থাকিতে ইচ্ছা করি।' তিনি বলিলেন– 'আচ্ছা বেশ, তিনি (হযরত আবদুল্লাহ) ক্রমাগত তিন রজনী তাঁহার সংসর্গে অবস্থান করত তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করিলেন। যখনই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইত তখনই তিনি আল্লাহ্‌র যিকির করিতেন; এতদভিন্ন তাঁহার অন্য কোন বিশেষ আমল (কাজ) তিনি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি (হযরত আবদুল্লাহ্) বলিলেন– 'আমি স্বীয় পিতার সহিত ঝগড়া করি নাই; কিন্তু রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আপনার সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন (সুসংবাদ দিলেন), এইজন্য আপনার ক্রিয়া-কলাপ জানিতে আসিয়াছিলাম।' তিনি (আনসারী) বলিলেন– 'আপনি যাহা দেখিলেন তদ্ব্যাতীত আমার আর কোন কার্য-কলাপ নাই।' হযরত আবদুল্লাহ (রা) চলিয়া যাইতে লাগিলে তাঁহাকে ডাকিয়া তিনি (আনসারী) বলিলেন– 'আরও একটি কথা আছে, আমি কাহারও সৌভাগ্যে ঈর্ষা করি নাই।' তিনি (হযরত আবদুল্লাহ) বলিলেন– 'তজ্জন্যই আপনার এই মরতবা।"

হযরত আওন ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) এক বাদশাহকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন– "কখনও অহঙ্কার করিও না, কারণ অহঙ্কারেই সর্বপ্রথম পাপ হইয়াছিল; অহঙ্কারের জন্যই শয়তান হযরত আদম আলায়হিস সালামকে সিজদা করে নাই। লোভ হইতে দূরে থাক; কেননা, লোভই হযরত আদম আলায়হিস সালামকে বেহেশ্‌ত হইতে বাহির করিয়াছিল। কখনও ঈর্ষা করিও না; কারণ ঈর্ষার জন্যই সর্বপ্রথম খুন হইয়াছিল; ইহারই প্রভাবে হযরত আদম আলায়হিস সালামের পুত্র স্বীয় ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিল। আর হযরত সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের জীবন-চরিত্র আলোচনা, আল্লাহ্‌র প্রশংসাবলী বর্ণনা বা নক্ষত্ররাজির প্রসঙ্গ হইলে নীরবে শ্রবণ কর, কথা বলিও না।"

হযরত বকর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন– "এক ব্যক্তি প্রত্যেকদিন এক বাদশাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিত– 'সাধু ব্যক্তির সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, দুর্বৃত্তকে তাহার কার্যফলের উপর ছাড়িয়া দাও। কারণ, তাহার কু-কর্মই তাহাকে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করিবে।' এই নীতিবাক্যের জন্য বাদশাহ তাহাকে ভালবাসিতেন। এক ব্যক্তি তৎপ্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া বাদশাহকে জানাইল– 'ইহার প্রমাণ কি?' সে বলিল– 'আপনি তাহাকে নিকটে আহবান করিয়া দেখুন, দুর্গন্ধ যাহাতে নাসিকায় প্রবেশ না

করে তজ্জন্য সে হাত দ্বারা নাসিকা ঢাকিয়া রাখিবে।' অপরদিকে এই ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি ঐ লোকটিকে স্বীয় গৃহে লইয়া যাইয়া কাঁচা রসুন মিশ্রিত খাদ্য অধিক পরিমাণে ভোজন করাইল। তৎপরই বাদশাহ তাহাকে নিকটে আহবান করিলেন। বাদশাহ্‌র নাসিকায় যাহাতে রসুনের দুর্গন্ধ প্রবেশ না করে তজ্জন্য সে হাত দ্বারা স্বীয় মুখ ঢাকিয়া রাখিল। বাদশাহ বুঝিলেন, ঐ ব্যক্তি সত্যই বলিয়াছে। বাদশাহ্‌র অভ্যাস ছিল যে, মহাপুরস্কার প্রদানের আদেশ ব্যতীত অন্য কিছুই স্বহস্তে লিখিতেন না। ঐ ব্যক্তির প্রতি বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বহস্তে আদেশপত্র লিখিলেন– 'পত্রবাহকের শিরচ্ছেদ করিয়া তাহার চর্মে ভূষি ভর্তি করত আমার নিকট প্রেরণ কর।' আদেশপত্রটি বাদশাহ নিজ হস্তে খামে পুরিয়া মোহর আঁটিয়া সেই ব্যক্তি মারফত তাঁহার এক কর্মচারীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সেই ব্যক্তি আদেশপত্র হস্তে দরবার হইতে বহির্গত হইলে ঐ ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল– 'ইহা কি?' সে বলিল– 'মহাপুরস্কারের আদেশপত্র।' ঐ ঈর্ষী ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে তৎপর আদেশপত্রটি লইয়া গেল। সে ইহা ঐ কর্মচারীর হস্তে দিবামাত্র তিনি তাহাকে বলিলেন– 'ইহাতে তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার চর্মে ভূষি ভর্তিপূর্বক বাদশাহ্‌র নিকট প্রেরণের আদেশ রহিয়াছে।' সে বলিল– 'সুবহানাল্লাহ্, এই আদেশ ত অপর এক ব্যক্তির উপর প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্বাস না হয় বাদশাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।' কর্মচারী বলিলেন– 'ইহাই বাদশাহ্‌র আদেশ, পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব কেন?' অনন্তর কর্মচারী সেই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। সেই ব্যক্তি পূর্ববৎ বাদশাহ্‌র সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া পরদিন সেই নীতিবাক্য উচ্চারণ করিল। বাদশাহ বিস্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– 'ঐ পত্র কি করিলে?' সে বলিল– 'অমুক ব্যক্তি আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গেল।' বাদশাহ বলিলেন– 'ঐ ব্যক্তি ত আমার নিকট বলিয়াছিল তুমি এইরূপ কথা বলিয়াছ।' সে উত্তর দিল– 'আমি কখনও সেইরূপ কথা বলি নাই।' বাদশাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন– 'আচ্ছা, তাহা হইলে সেই দিন তুমি মুখ ও নাসিকা হস্ত দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে কেন?' সে বলিল– 'সেই ব্যক্তি আমাকে কাঁচা রসুন খাওয়াইয়া ছিল।' বাদশাহ বলিলেন– 'তুমি যে প্রত্যহ বল– 'দুর্বৃত্তের কর্মই তাহার শাস্তিদাতা' ইহা সত্যে পরিণত হইল।"

হযরত ইব্ন সীরান (র) বলেন– "পার্থিব উন্নতিতে আমি কাহাকেও ঈর্ষা করি নাই। কারণ, সেই ব্যক্তি বেহেশ্‌তী হইয়া থাকিলে বেহেশ্‌তের নিআমতের তুলনায় দুনিয়া নিতান্ত তুচ্ছ। আর সেই ব্যক্তি দোযখী হইয়া থাকিলে তথায় আগুনে জ্বলিবে; দুনিয়ার সুখ-সম্পদে তাহার কি লাভ?" হযরত হাসান বস্‌রীকে (র) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল– "মুসলমান কি ঈর্ষা করে?" তিনি বলিলেন– "হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালামের পুত্রগণের উপাখ্যান কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? তবে যাহা আচরণে

প্রকাশ পায় না তেমন ঈর্ষা কোন ক্ষতি করে না।" হযরত আবূ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "যে ব্যক্তি অধিক মৃত্যু চিন্তা করে সে না আনন্দিত হয়, না ঈর্ষা করে।"

ঈর্ষার পরিচয়—অপরের সুখ-সম্পদ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া মনে কষ্ট অনুভব করা এবং তাহার সেই সুখ-সম্পদ দূর হওয়ার কামনাকে ঈর্ষা বলে। ঈর্ষা হারাম। হাদীসের বিভিন্ন উক্তি, আল্লাহ্‌র কার্য ও বিধানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির অসন্তোষ প্রকাশ এবং অপরের সুখ-সম্পদে তাহার ঈর্ষা উদ্রেকের জঘন্য ও ক্ষতিকর মনোভাব ঈর্ষা হারাম হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে সম্পদ তুমি লাভ করিতে পার নাই, অপরের ভাগ্যে ঘটিয়াছে দেখিয়া তাহা লোপ হউক, তোমার এই মনোভাবকে জঘন্য ও কদর্য ব্যতীত আর কী বলা যাইতে পারে?

পারলৌকিক কার্যে প্রতিযোগিতা মঙ্গলজনক—অপরের সম্পদ লাভে যদি তুমি অসন্তুষ্ট না হও এবং ইহা নষ্ট হওয়ার কামনাও না কর, অথচ তুমি সেইরূপ সম্পদ পাইতে চাও, তবে তোমার এই প্রকার মনোভাবকে গিব্‌তা (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) এবং মুনাফাসা (প্রতিযোগিতা) বলে। পারলৌকিক কার্যে উহা উত্তম, বরং অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

অর্থাৎ "আর লালসাকারিগণের পক্ষে এইরূপ জিনিসের প্রতি লালসা করা উচিত।" আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ "তোমরা আপন প্রভুর ক্ষমার দিকে ধাবিত হও।" অর্থাৎ "দৌড়িয়া চল, একজন অপরজন অপেক্ষা অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "দুইটি স্থলে ঈর্ষা হইয়া থাকে। প্রথম– আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে ধন ও জ্ঞান উভয়ই দান করিয়াছেন, সে স্বীয় ধন জ্ঞান অনুসারে সদ্ব্যবহার করে; অপর ব্যক্তিকে তিনি ধন ব্যতীত শুধু জ্ঞান দান করিয়াছেন, তেমন ব্যক্তি যদি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া বলে– "আল্লাহ্ আমাকেও ধন দান করিলে আমিও তাহার ন্যায় (সৎকার্যে) ব্যয় করিতাম" তাহা হইলে এই দুই ব্যক্তিই সমান সওয়াব পাইবে। আর কেহ যদি পাপকার্যে ধন অপচয় করে এবং অপর ব্যক্তি (ইহা দেখিয়া) বলে– 'আমার ধন থাকিলে আমিও তদ্রূপ (পাপ কার্যে) অপচয় করিতাম', তাহা হইলে এই দুই ব্যক্তিই সমান পাপী হইবে।" এই হাদীসে প্রথমোক্ত স্থলে প্রথম ব্যক্তির ধন-দৌলতের সমান দ্বিতীয় ব্যক্তির ধন লাভের ইচ্ছাকে 'মুনাফাসাত' না বলিয়া 'হাসাদই' বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রথম ব্যক্তির

ধন-দৌলত লাভে দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে বিরক্তি, অসন্তোষ ও সেই ধন বিলুপ্তির কামনা নাই। বিরক্তি কোন স্থলেই জায়েয নহে।

কুকর্ম সহায়ক সম্পদের বিনাশ-কামনা সঙ্গত—কাহারও সম্পদ বিলোপের কামনা সঙ্গত নহে; কিন্তু যে সম্পদ দুরাচার ও অত্যাচারীর হস্তগত হইলে তাহাদের অপকর্ম ও অত্যাচারের কারণ হয়, উহার বিলোপ কামনা জায়েয। বাস্তবপক্ষে, ইহা সম্পদ বিলোপের কামনা নহে, বরং অপকর্ম ও অত্যাচারের প্রতিরোধ কামনামাত্র। কিন্তু দুরাচার ও অত্যাচারীর সম্পদ বিনাশের কামনা বাস্তবপক্ষে তাহাদের অপকর্ম ও অত্যাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হইল কিনা ইহা বুঝিবার উপায় এই– তাহারা তওবা করিয়া অপকর্ম ও অত্যাচার হইতে নিরস্ত হইলে তাহাদের সম্পদ বিলোপের কামনা তোমাদের অন্তরে যদি না থাকে, তবে মনে করিবে, ইহা পাপকর্ম প্রতিরোধের জন্যই ছিল। কিন্তু তখনও তোমাদের অন্তরে তাহাদের সম্পদ বিলোপের কামনা থাকিলে বুঝিবে, ইহা ঈর্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সম্পদের অসমতায় ঈর্ষার উৎপত্তি—এ স্থলে একটি সুক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করা হইতেছে। মনে কর, আল্লাহ্ কাহাকেও কোন বিশেষ সম্পদ দান করিলেন। অপর ব্যক্তিও এইরূপ সম্পদের জন্য লালায়িত হইল, কিন্তু কিছুতেই সে ইহা লাভ করিতে পারিল না। এমতাবস্থায়, সম্পদের অসমতা দেখিয়াই তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। তখন সম্পদশালীর সম্পদ বিনাশ হইয়া অসমতা বিদূরীত হইলে তাহার মনঃকষ্ট দূর হইতে পারে। অপরের সম্পদ দেখিলেই মানব মনে ইহার অভিলাষ হয়। কিন্তু ইহা অর্জনে অসমর্থ হইয়া অপরের সম্পদ বিনাশের কামনা করাই ক্ষতিকর বলা চলে না। কিন্তু এইরূপ সম্পদ প্রত্যাশী ব্যক্তি সম্পদশালীর বিষয়ে অবাধ ক্ষমতা পাইলেও সে ইহা বিনাশ না করিলে বা ছিনাইয়া না লইলে মনে করিবে, তাহার হৃদয়ে ঈর্ষা নাই। এমতাবস্থায়, অপরের সমান সম্পদ লাভের কামনা অন্তরে থাকিলেই সে আল্লাহ্‌র বিচারে দায়ী হইবে না।

ঈর্ষা দমনের উপায়—ঈর্ষা অন্তরের কঠিন ব্যাধি। ইহার জ্ঞানমূলক ও অনুষ্ঠানমূলক ঔষধ রহিয়াছে।

জ্ঞানমূলক ঔষধ—ঈর্ষার অপকারিতা উপলব্ধি করা। ঈর্ষার ফলে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির ইহ-পরকালের ক্ষতি হইয়া থাকে; কিন্তু বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির কোনই ক্ষতি হয় না, বরং ইহ-পরকালের তাহার লাভ হইয়া থাকে।

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির ক্ষতি—আল্লাহ্‌র বিধানে মানবের উপর অহরহ নিআমত বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি অপরের সম্পদ দেখিয়া সর্বদা মনঃকষ্টে ও দুঃখে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে থাকে। সে স্বীয় শত্রুকে যেরূপ দুঃখ ও মনঃকষ্টে জর্জরিত দেখিতে চাহিয়াছিল সে নিজেই তদ্রূপ দুঃখ যন্ত্রণায় কালাতিপাত করে।

ঈর্ষার যন্ত্রণার ন্যায় আর কোন যন্ত্রণাই নাই। অতএব অপরের অমঙ্গল কামনায় নিজকে দুঃখে ও মনস্তাপে জর্জরিত করা অপেক্ষা নির্বোধের কাজ আর কি হইতে পারে? অপরের ঈর্ষাতে বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির কোনই ক্ষতি হয় না। কারণ, আল্লাহ্ যাহার অদৃষ্টে যে-সম্পদ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে, পরিমাণে ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি ও সময়ের দিকে আর অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই সংঘটিত হইবে না। কেননা, সৃষ্টির প্রারম্ভে যে অদৃষ্টলিপি বিধিবদ্ধ হইয়াছে তদনুসারেই মানুষ সম্পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া সম্পদ লাভের কারণস্বরূপ শুভলক্ষণ ও নক্ষত্ররাজির উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে, অদৃষ্ট অপরিবর্তনশীল।

একজন নবী (আ) এক সম্রাজ্ঞীর শাসন-উৎপীড়নে অসহ্য হইয়া তাহার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ জানাইলেন। ইহার উত্তরে ওহী অবতীর্ণ হইল ঃ فَرَّ مِنْ قُدَّامِهَا حَتّٰى تَنْقَضِىَ اَيَّامُهَا অর্থাৎ "অদৃষ্টলিপি পরিবর্তিত হইবে না। এই সম্রাজ্ঞীর রাজত্বকাল আরও বাকী আছে; তুমি ইচ্ছা করিলে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পার।" অপর একজন নবী (আ) বিপদাপদে জর্জরিত হইয়া উহা মোচনের জন্য আল্লাহ্র নিকট বহু প্রার্থনা ও রোদন করিলেন। তৎপর এই মর্মে ওহী অবতীর্ণ হইল– " যে দিবস আমি যমীনের সহিত আসমানের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছি, সেই দিবস উহাও তোমার অদৃষ্টে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তোমার জন্য পূর্ব বিধান রহিত করিয়া আবার নতুন বিধান লিপিবদ্ধ করিতে বল কি?"

ফলকথা এই, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির ইচ্ছার প্রভাবেই বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির সম্পদ বিদূরিত হয় না। তাহা হইলে ইহার ক্ষতি প্রকারান্তরে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির উপরই আবার ঘুরিয়া আসিবে এবং তাহার স্বীয় সম্পদও বিলুপ্ত হইবে। যেমন মনে কর, তুমি কাহারও সম্পদ দেখিয়া ঈর্ষা করিলে এবং ইহাতে তাহার সম্পদ নষ্ট হইল, এখন তোমার সম্পদ দর্শনেও ত অপর কেহ ঈর্ষা করিতে পারে? এমতাবস্থায়, তোমার সম্পদও বিলুপ্ত হওয়া উচিত। আবার দেখ, ঈর্ষাতে বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট হইলে কাফিরদের ঈর্ষার ফলে মুসলমানগণ ঈমানরূপ পারলৌকিক অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইত। কিন্তু ইহা হয় নাই। কাফিরদের কামনা সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ

অর্থাৎ "আহ্লে কিতাবের কেহ কেহ তোমাদিগকে বিপথগামী করিয়া দিতে অন্তরের সহিত কামনা করে।" (সূরা আল ইমরান, রুকূ ৭. পারা ৩)।

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির ইহজগতে ভীষণ মনঃকষ্ট এবং পরজগতে ভয়ানক ক্ষতি হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে যাহা উত্তম বিবেচনা করিতেছেন তাহাই পূর্ণ কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। বিশ্ব-কারখানায় তাঁহার যে কৌশল জীবন্তভাবে

প্রচলিত থাকিয়া অহরহ কাজ করিয়া যাইতেছে, তিনি ভিন্ন উহার গুপ্ত রহস্য বুঝিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কিন্তু ঈর্ষী ব্যক্তি এই মঙ্গলজনক বিধানের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাঁহার বন্টন-নীতিও সে মানিয়া লইতে পারে না। সুতরাং এই অসন্তুষ্টি ও অসম্মতির দরুণ আগুন তাহার হৃদয়ে সর্বদা জ্বলিতে থাকে। তাওহীদের আমানতে মুমিনকে সম্মানিত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, আল্লাহ্র বিধানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা অপেক্ষা অধিক খিয়ানত এই আমানতে আর কি হইতে পারে? শয়তান মুসলমানের চিরশত্রু, মুসলমানের অমঙ্গল কামনাই তাহার একমাত্র কাজ। ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া এক মুসলমান অপর মুসলমানের অমঙ্গল করিলে সে শয়তানের কাজে শরীক হইল। মুসলমানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির লাভ—ঈর্ষী ব্যক্তি দুঃখকষ্টে নিপতিত থাকুক, বিদ্বেষভাজন ব্যক্তি ইহা কামনা করিতে পারে। ঈর্ষার ন্যায় কষ্টদায়ক আর কিছুই নাই। সুতরাং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা মানসিক যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করে বলিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি একাধারে যালিম ও মযলুম, বরং তাহার ন্যায় মযলুম আর কেহই নাই। বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে সে যালিম; আর সেই ঈর্ষার ফলে সে নিজেই দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয় বলিয়া সে মযলুম। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদে বা সে ঈর্ষা হইতে মুক্তি পাইয়াছে জানিলে বিদ্বেষভাজন ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া থাকে। কারণ, সম্পদে অপরে তাহাকে ঈর্ষা করুক এবং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি দুঃখকষ্টে নিপীড়িত হউক, ইহাই সে কামনা করিয়া থাকে।

বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির পারলৌকিক লাভের দিকে লক্ষ্য কর। সে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা অত্যাচারিত। ঈর্ষার বশীভূত হইয়া কেহ কাহারও নিন্দা করিলে, অপ্রিয় কথা বলিলে এবং কাজ-কারবারের কোন ক্ষতি করিলে ঈর্ষী ব্যক্তির আমলনামা হইতে সওয়াব লইয়া বিদ্বেষভাজন ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে। আর তাহার সওয়াব না থাকিলে বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির পাপ ঈর্ষী ব্যক্তির স্কন্ধে চাপানো হইবে। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির পার্থিব সম্পদের বিলোপ কামনা করে। কিন্তু ইহাতে তাহার সম্পদ বিলোপ হয় না, বরং তাহার পারলৌকিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অপরপক্ষে, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ঈর্ষার দরুণ ইহকালে ভীষণ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করে, আর পারলৌকিক আযাবের উপকরণস্বরূপ তাহার পাপরাশি পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি নিজকে স্বীয় বন্ধু ও বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির শত্রু বলিয়া মনে করে, কিন্তু বাস্তবপক্ষে সে স্বীয় শত্রু এবং বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির বন্ধু। কেননা, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোকে নিজেকে দুঃখকষ্টে জর্জরিত করিয়া রাখে এবং পরলোকে তাহাকে কঠিন শাস্তির উপযোগী করিয়া তোলে। আলিম ও পরহেযগার ধনবানগণ সৎকর্মে ধন ব্যয় করিতেছে দেখিয়া কেহ তাহাদিগকে আন্তরিক ভালবাসিলে সে স্বয়ং গুণী ও সৎকর্মী না হইলেও সওয়াব পাইবে। কিন্তু মানবের পরম শত্রু শয়তান ইহা সহ্য

করিবে কিরূপে? অতএব, সে লোককে ঈর্ষার বশীভূত করিয়া তাহার সওয়াব নষ্ট করত পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। আলিম ও দীনদার সৎকর্মী লোকদিগকে ভালবাসা সওয়াব লাভের সহজ উপায়। যে ব্যক্তি তাহাদিগকে ভালবাসিবে কিয়ামতের দিন সে তাহাদের সঙ্গেই অবস্থান করিবে। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি নিজে আলিম বা ইলম শিক্ষার্থী অথবা আলিম ও ইলম শিক্ষার্থীদিগকে ভালবাসে, সেই সওয়াবের অধিকারী; কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি সওয়াব লাভের এই ত্রিবিধ উপায় হইতেই বঞ্চিত।

ঈর্ষাপরায়ণ লোকের অবস্থা নিতান্ত নির্বোধ ব্যক্তিসদৃশ। মনে কর, এক নির্বোধ অপরের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রস্তর বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির দেহে না লাগিয়া ঘুরিয়া আসিয়া নিক্ষেপকারীর ডান চক্ষুর উপর পতিত হইল এবং তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া আবার খুব জোরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। এবারও প্রস্তরটি ফিরিয়া আসিয়া তাহার অপর চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল। সে আবার ততোধিক জোরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিল, ইহা ফিরিয়া আসিয়া তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এইরূপে বারবার প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি স্বীয় দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিল। বিদ্বেষভাজন ব্যক্তি অক্ষত দেহে নিরাপদে থাকিয়া প্রস্তর নিক্ষেপকারীর দুরাবস্থা দর্শনে হাসিতে লাগিল। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরও ঠিক এইরূপ দুরাবস্থা ঘটিকা থাকে। শয়তান তাহার এই দুর্গতি দেখিয়া উপহাস করিতে থাকে।

ঈর্ষা হইতে উল্লিখিত আপদসমূহ দেখা দেয়। তদুপরি ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া কেহ অপরের নিন্দা করিলে, মিথ্যা বলিলে বা সত্য কথা অস্বীকার করিলে, তাহার উপর বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির দাবী অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে এবং মহাবিচারের দিনে তাহার আমলনামা হইতে সেই পরিমাণে সওয়াব বিদ্বেষভাজন ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে। অতএব ঈর্ষার যে সকল ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইল উহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারিলে বুদ্ধিমান মানুষ হলাহল বিবেচনায় ইহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এই সকল বোধকেই ঈর্ষা ব্যাধির জ্ঞানমূলক ঔষধ বলে।

অনুষ্ঠানমূলক ঔষধ—কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টায় মন হইতে ঈর্ষার কারণগুলি বাহির করিতে হইবে। ক্রোধের বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে, অহঙ্কার, ওজ্‌ব অর্থাৎ নিজেকে নিজে ভাল মনে করা, শত্রুতা, প্রভুত্ব ও সম্মান কামনা, ধনলিপ্সা ইত্যাদি ঈর্ষার মূল কারণ। অতএব, এই কুপ্রবৃত্তিসমূহ হৃদয় হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলিবে। এই প্রকার কার্যকে জোলাপ বা বহিষ্কারক ঔষধ বলে। ইহা ব্যবহারের মাধ্যমে ঈর্ষার মূলসমূহ উৎপাটন করিয়া ফেলিলে মনে ঈর্ষা স্থান পাইবে না। অন্তরে ঈর্ষার ভাব উদ্ভব হইলে বিরুদ্ধাচরণে ইহার প্রতিরোধ করিবে। ইহা কাহাকেও তিরস্কার করিতে বলিলে তাহার প্রশংসা করিবে, অহঙ্কার করিতে আদেশ করিলে নম্রতা দেখাইবে,

কাহারও সম্পদ বিনাশের চেষ্টায় তৎপর হইতে বলিলে বা কাহারও সঙ্গে শত্রুতা করিবার উস্কানি দিলে বন্ধুভাবে তাহার সাহায্য করিবে।

অগোচরে বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির প্রশংসা কীর্তন ও তাহার কার্যে সহায়তা তুল্য উপকারী ঈর্ষার প্রতিষেধক আর কিছুই নাই। এইরূপে অসাক্ষাতে কাহারও প্রশংসা ও সাহায্য করিলে সেই ব্যক্তির অন্তর আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিবে। সেই আনন্দের ছায়া তোমার অন্তরে যাইয়া পড়িবে এবং ইহাতে তোমার হৃদয়ও আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে ঈর্ষা আর কখনও অন্তরে জাগিবে না এবং শত্রুতাও তিরোহিত হইবে; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ -

অর্থাৎ "তুমি পাপকে সেই স্বভাব দ্বারা দূর কর যাহা অতি উত্তম। (এইরূপ করিলে) পরে তোমার ও যাহার (যে ব্যক্তির) মধ্যে শত্রুতা আছে, অকস্মাৎ যেন সে (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া যাইবে।" (সূরা হামীম সিজ্‌দা, রুকু ৫, পারা ২৪)।

ঈর্ষা পোষণে শয়তানের প্ররোচণা- উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী সদ্ব্যবহারে শত্রুতা বিনাশের চেষ্টা করিলে শয়তান নানাপ্রকার প্ররোচণা দিতে থাকিবে। সে বলিবে- "শত্রুর সহিত নম্র ব্যবহার এবং তাহার প্রশংসা করিলে সে তোমাকে দুর্বল মনে করিবে।" আল্লাহ্‌র আদেশ তুমি শ্রবণ করিলে এবং শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কেও তোমাকে জানাইয়া দেওয়া হইল। এখন তোমার স্বাধীন ক্ষমতা অনুসারে তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।

উপরে যে ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া হইল উহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী; কিন্তু খুব তিক্ত। যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে এবং ঈর্ষাই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি ধ্বংসের মূল, সেই ব্যক্তিই এইরূপ তিক্ততা সহ্য করিতে সমর্থ হয়। তিক্ততা ও কষ্ট সহ্য করিতে হয় না, এমন ঔষধ নাই। অতএব সুমিষ্ট ঔষধের আশা পরিত্যাগ করত তিক্ত ঔষধই সেবন করিতে হইবে; অন্যথায় ক্রমান্বয়ে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ততোধিক কষ্টে জীবন ধ্বংস করিবে।

ঈর্ষার ক্ষতি হইতে অব্যাহতির উপায়—অশেষ সাধনা দ্বারাও তোমার অন্তর হইতে শত্রু-মিত্রের প্রভেদ জ্ঞান একেবারে বিনাশ করিতে পারিবে না; উভয়ের সম্পদ ও বিপদে তোমার অন্তরে পার্থক্য উপলব্ধি করিবে। তোমার হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবেই শত্রুর সম্পদে কিছুটা ভার বোধ হইবে। এই স্বভাবগত মনোভাব পরিবর্তন করা

মানব-ক্ষমতার বহির্ভূত। কিন্তু দুইটি কাজ তাহার ক্ষমতাধীন রহিয়াছে; যথা ঃ (১) শত্রুর প্রতি স্বাভাবিক বিরক্তি বাক্যে ও কর্মে কখনও প্রকাশ না করা এবং (২) জ্ঞান ও বুদ্ধির বিচারে সেই স্বাভাবিক মনোভাবের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। সেই মনোভাব নিতান্ত জঘন্য এবং মন হইতে উহা বিলুপ্ত হউক, একান্তভাবে এই কামনা করা। এই দ্বিবিধ কাজ করিতে পারিলে স্বাভাবিক ঈর্ষার মনোভাবের জন্য আল্লাহ্‌র বিচারে কেহই দায়ী হইবে না।

কেহ কেহ বলেন- ঈর্ষার ভাব বাক্যে ও কর্মে প্রকাশ না করাই যথেষ্ট। ইহার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ না করিলেও আল্লাহ্‌র বিচারে দায়ী হইবে না। এই অভিমত ঠিক নহে। ঈর্ষার প্রতি ঘৃণা না রাখিলে আল্লাহ্‌র বিচারে দায়ী হইতে হইবে। কারণ, ঈর্ষা হারাম। ইহা হৃদয়ের কাজ, দেহের কাজ নহে। কেহ যদি কোন মুসলমানের দুঃখ কামনা করে এবং তাহার আনন্দে দুঃখিত হয়, তবে সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র বিচারে দায়ী হইবে। কিন্তু সেই ভাবের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করত ইহা গুপ্ত রাখিলে সে ঈর্ষার আপদ হইতে অব্যাহতি পাইবে।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে, অসীম সাধনায়ও মানব-হৃদয় হইতে শত্রু-মিত্রের প্রভেদ জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু তাওহীদভাবে প্রবল হইয়া যাঁহাকে একেবারে তন্ময় করিয়া ফেলিয়াছে, যিনি ইহার প্রভাবে সকল মানুষকে আল্লাহ্‌র গোলামরূপে দেখিতে পান এবং সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ একমাত্র আল্লাহ্‌ হইতেই সমাধা হইতে দর্শন করেন, কেবল এইরূপ ব্যক্তিই শত্রু-মিত্রের প্রভেদ জ্ঞান ভুলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ উন্নত মনোভাব নিতান্ত বিরল; বিদ্যুতের ন্যায় চমকিয়া নিমিষেই মিলাইয়া যায়; দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়

সংসারাসক্তি ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়

সংসারাসক্তি—সংসার সকল দোষের আকর ও সংসারাক্তি সমস্ত পাপের মূল। সংসার আল্লাহ্‌র শত্রু, আল্লাহ্‌ প্রেমিকদের শত্রু এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদিগের শত্রু। সুতরাং ইহা অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত আর কি হইতে পারে!

পথ চলারকালে সংসারাসক্তি পরকালের যাত্রীদের পথের সম্বল ও সদগুণরাজি ছিনাইয়া লইয়া যায় এবং তজ্জন্য তাহারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। এইজন্যই সংসার আল্লাহ্‌র শত্রু। সংসার নানারূপ রমণীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আল্লাহ্‌ প্রেমিকদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং ইহার প্রতারণা ও প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে এইজন্যই সংসার আল্লাহ্‌ প্রেমিকদের শত্রু। সংসার আল্লাহ্‌র শত্রু এবং যাহারা নিতান্ত সংসারাসক্ত তাহারও আল্লাহ্‌র শত্রু। সংসার ইহার বন্ধুগণকে নানারূপ ছলে কৌশলে স্বীয় প্রেমফাঁদে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। কিন্তু তাহারা ইহার প্রেমে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলে ইহা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং তাহাদের শত্রুদের নিকট যাইয়া ধরা দেয়।

সংসারের ধোঁকাবাজি—সংসার কুলটা রমণীর ন্যায় একজনকে পরিত্যাগ করিয়া অপরজনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইতে চায়। কঠোর পরিশ্রমে ও অতি কষ্টে মানুষ সংসার অর্জন করিয়া থাকে; তৎপর অনতি বিলম্বেই সে ইহার বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করে এবং পরকালে আল্লাহ্‌র প্রচণ্ড ক্রোধ ও ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত হয়। দুনিয়ার ফাঁদ হইতে কেহই নিস্তার পায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার প্রতারণা ও আপদসমূহ সমক্যরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাকে বর্জন করিয়াছে, কেবল তেমন ব্যক্তিই ইহার প্রবঞ্চনা হইতে নিস্তার পাইতে পারে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "দুনিয়া বর্জন কর, ইহা হারূত ও মারূত (ফেরেশতাদ্বয়) অপেক্ষা অধিক যাদুকর।"

সংসারাসক্তি বর্জনে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান—মূল গ্রন্থের ভূমিকায় তৃতীয় অধ্যায়ে দুনিয়ার পরিচয়, আপদ ও প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। কুরআন শরীফের বহু আয়াতে দুনিয়ার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। মানবকে দুনিয়ার

প্রলোভন হইতে ফিরাইয়া পরকালের দিকে আহ্বানের উদ্দেশ্যে এবং মানবজাতিকে ইহার প্রবঞ্চনা ও আপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিলে যাহাতে তাহারা উহা বর্জন করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে আল্লাহ্ অগণিত পয়গম্বর ও অসংখ্য আসমানী কিতাব প্রেরণ করিয়াছেন। এস্থলে দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কে কতিপয় হাদীস বর্ণিত হইতেছে।

হাদীসে দুনিয়ার নিন্দা—একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি মৃত ছাগলের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় স্বীয় সহচরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- "দেখ, এই মৃত প্রাণীটি এত ঘৃণিত যে, ইহার দিকে কেহ দৃষ্টিপাতও করে না। যে আল্লাহ্‌র হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ তাঁহার শপথ, আল্লাহ্‌র নিকট সংসার ইহা অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত। আল্লাহ্‌র নিকট সংসার মশক-পালকের তুল্য হইলে কোন কাফির পান করিবার জন্য এক অঞ্জলী পানিও পাইত না।" তিনি বলেন- "সংসার অভিশপ্ত এবং সংসারে যাহা কিছু আছে তাহাও অভিশপ্ত, কিন্তু যাহা আল্লাহ্‌র জন্য আছে (তাহা প্রশংসিত)।" তিনি বলেন- "সংসারাসক্তি সকল পাপের অগ্রগামী সরদার।" তিনি আরও বলেন- "যে ব্যক্তি পরকালকে ভালবাসে সে সংসারের অনিষ্ট করে। অতএব অস্থায়ী বস্তু বর্জনপূর্বক স্থায়ী বস্তু গ্রহণ কর।" অর্থাৎ সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরকাল অবলম্বন কর।

হযরত যায়েদ ইব্‌নে আকরাম বলেন- "আমি হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর সহিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহাকে মধুমিশ্রিত পানি দিল। তিনি ইহা মুখ পর্যন্ত উত্তোলনপূর্বক সরাইয়া লইলেন এবং এত তুমুল রোদন করিতে লাগিলেন যে, ইহাতে আমরাও রোদন করিলাম। তিনি কতক্ষণ চুপ থাকিয়া আবার রোদন করিতে লাগিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও সাহস হইল না। তিনি রোদনে বিরত হইলে লোকে নিবেদন করিল- 'হে রাসূলাল্লাহ্‌র খলীফা, আপনার রোদনের কারণ কি?' তিনি বলিলেন- 'একদা আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বসিয়া ছিলাম। এমন সময় দেখিতে পাইলাম তিনি স্বীয় পবিত্র হস্তে তাঁহার নিকট হইতে যেন কোন কিছু দূরে সরাইয়া দিতেছেন, অথচ কোন জিনিসই তথায় দেখা যাইতেছিল না। আমি নিবেদন করিলাম- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইহা কি?' হযরত (সা) বলিলেন- 'ইহা দুনিয়া। সে নিজেকে আমার নিকট সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিল, আমি ইহাকে তাড়াইয়া দিলাম। সে আবার আসিয়া বলিল- 'আপনি ত আমা হইতে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু আপনার পরে যাহারা থাকিবে তাহারা আমার হাত হইতে রক্ষা পাইবে না।' ইহা বলিয়া তিনি হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন- 'এখন আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, দুনিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আল্লাহ্ এমন কোন পদার্থ সৃষ্টি করেন নাই, যাহা তাঁহার নিকট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শত্রু। দুনিয়াকে সৃষ্টি করা অবধি তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই।" তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে গৃহ বলিয়া মনে করিবে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে গৃহহীন; যে দুনিয়ার ধনকে ধন মনে করিবে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে ধনহীন এবং যে দুনিয়াতে আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিবে সে প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধিহীন। যাহার জ্ঞান নাই সে-ই ইহার জন্য অপরকে ঈর্ষা করে; যাহার ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) নাই, সে ইহার অন্বেষণ করে।" তিনি বলেন- "প্রত্যুষে শয্যাত্যাগকালে যাহার অধিক শক্তি সংসারের দিকে নিয়োজিত থাকে সে কখনও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অন্তর্ভূক্ত নহে। কেননা তাহার জন্য দোযখ নির্ধারিত এবং তাহার হৃদয়ে চারিটি বস্তু অবশ্যই থাকিবে। **প্রথম**- অসীম দুঃখ যাহা কখনও নিঃশেষ হয় না; **দ্বিতীয়**- অপার কর্মব্যস্ততা যাহা হইতে সে কখনও অবকাশ পায় না; **তৃতীয়**- অনন্ত দৈন্য যাহা কাটাইয়া সে কখনও ধনবান হইতে পারে না; **চতুর্থ**- অফুরন্ত আশা যাহার কোন সীমা নাই।"

হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'তুমি কি চাও যে, দুনিয়া কি পদার্থ, ইহা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করি?' ইহা বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন এবং এক ভাগাড়ের দিকে আমাকে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে মানুষ, ছাগল ইত্যাদির মস্তকাস্থি, ছিন্ন বস্ত্রাদি ও মানুষের মলমূত্র স্তূপীকৃত ছিল। তিন বলিলেন- 'হে আবূ হুরায়রা, তোমাদের মস্তকের ন্যায় তাহাদের মস্তকও লোভ-লালসায় পূর্ণ ছিল। এখন চামড়া মাংস স্খলিত হইয়া শুধু হাড় পড়িয়া রহিয়াছে, উহাও অনতিবিলম্বে মাটিতে মিশিয়া যাইবে। এইসব মলমূত্র নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রী ছিল। উহা বহু চেষ্টায় সংগ্রহও করা হইয়াছিল, এখন এমন ঘৃণিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, লোকে উহা দেখামাত্র পলায়ন করে। আর এই সকল ছিন্ন বস্ত্র তাহাদের দেহের উপর বহু মূল্য বসন-ভূষণরূপে গর্বভরে সঞ্চালিত হইত, এখন ছিন্ন নেকড়ারূপে বাতাসে উড়িতেছে। আর এই সমস্ত তাহাদের অশ্বাদি, বাহন ও পালিত প্রাণীর হাড়। এককালে তাহারা এই সমস্ত বাহনে আরোহণপূর্বক গর্বভরে দুনিয়ার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই সকলই দুনিয়া। দুনিয়ার এই অবস্থা দর্শনে কেহ রোদন করিতে চাহিলে বল, সে রোদন করুক। কারণ, ইহা রোদনেরই স্থান।' ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই রোদন করিতে লাগিল। তৎপর হযরত (সা) আবার বলিলেন- 'দুনিয়া সৃজন করা অবধি ইহা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলিতেছে। আল্লাহ্ ইহার প্রতি আর দৃষ্টিপাতও করেন নাই। কিয়ামতের দিন দুনিয়া নিবেদন করিবে- 'হে খোদা, আপনার নিকৃষ্ট দাসগণকে

আমার হস্তে সমর্পণ করুন।' আল্লাহ্ বলিবেন- 'হে অপদার্থ, নীরব থাক্। ঐ জগতে ত আমি পছন্দই করি নাই যে, তোকে কেহ লাভ করুক, এখন কিরূপে ইহা করিতে পারি?"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কতক লোক কিয়ামতের দিন সমাগত হইবে; তাহাদের সৎকাজ 'থামা' পাহাড়ের সমান হইবে অথচ তাহাদিগকে দোযখে পাঠান হইবে।" উপস্থিত লেকে নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তাহারা কি নামাযী লোক হইবে?" তিনি বলিলেন- "হাঁ, তাহারা নামাযী, রোযাদার, রজনীতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদতকারী; কিন্তু দুনিয়ার বিষয়াদিতে নিমজ্জিত থাকার দরুন (তাহাদিগকে দোযখে পাঠান হইবে)।" একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমকে বলিলেন, "এমন ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে অন্ধ এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে দৃষ্টিশক্তি পাইবার আশা করে? অবগত হও, দুনিয়াকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালবাসে ও যত বেশী আশা হৃদয়ে পোষণ করে তাহার অন্তর আল্লাহ্ সেই পরিমাণে অন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি সংসার বিরাগী এবং অতি সামান্য আশা রাখে, আল্লাহ্ স্বয়ং বিনা উস্তাদে তাঁহাকে মহা ইল্‌ম শিক্ষা দেন এবং কোন পথপ্রদর্শকের মধ্যস্থতা ব্যতীত তিনি স্বয়ং তাহাকে সুপথ প্রদর্শন করেন।"

হযরত আবূ উবায়দাহ্ ইব্‌নে যার্‌রাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা বাহ্‌রাইন রাজ্য হইতে বহু ধন মদীনা শরীফে রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ফজরের নামাযে আন্‌সারগণ অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হইলেন। নামাযান্তে তাঁহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইলে মৃদ্যুহাস্যে তিনি বলিলেন- "তোমরা বোধ হয় ধন আগমনের কথা শুনিয়াছ?" তাঁহারা বলিলেন- "হাঁ।" তৎপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনা ঘটিবে, যাহাতে তোমরা আনন্দিত হইবে; (অর্থাৎ ধন বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু ইহা স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে)। তোমাদের দরিদ্রতা দর্শনে আমার ভয় হয় না। কিন্তু এই বিষয়ে আমি ভয় পাইতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সংসারে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করেন, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতিকে তিনি ধন-সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন, আর তোমরা এই ধন-সম্পদ লইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাও, যেমন তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন- "কোন প্রকারেই দুনিয়ার চিন্তায় লিপ্ত হইও না।" প্রিয় পাঠক, সতর্ক হও, যে দুনিয়া সম্বন্ধে চিন্তা

করিতে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, ইহাকে ভালবাসা ও ইহার অর্জনে তৎপর হওয়া কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের একটি উটনী ছিল, ইহার নাম ছিল 'আযবা'। ইহা সর্বপেক্ষা দ্রুতগামী ছিল। একদা পল্লীবাসী এক ব্যক্তি একটি উট আনিল এবং 'আযবা'র সহিত ইহার দৌড় করানো হইল। ইহাতে ঐ (ব্যক্তির) উট জয়ী হইল। মুসলমান ইহা দেখিয়া দুঃখিত হইলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "আল্লাহ্ দুনিয়াতে এমন কিছুকেই সম্মানিত করেন না যাহাকে তিনি (পরকালে) অপমানিত করিবেন না।" (এই হাদীসের মর্ম এই- আল্লাহ্ যাহাদিগকে দুনিয়াতে সম্মানিত করেন তাহাদের সকলকেই আখিরাতে তিনি অপমানিত করিবেন, তাহা নহে, বরং বেঈমানকে দুনিয়াতে সম্মানিত করিলে আখিরাতে তিনি তাহাকে অপমানিত করিবেন)।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "তৎপর দুনিয়া তোমাদের উপর প্রসন্ন হইবে, কিন্তু ইহা তোমাদের ধর্ম এইরূপে খাইয়া ফেলিবে, যেমন আগুন শুষ্ক কাষ্ঠ ভস্ম করিয়া ফেলে।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন- "দুনিয়াকে খোদা বানাইও না। তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে গোলামে পরিণত করিবে। ধন এইভাবে রাখিবে যেন, অপচয়ের আশঙ্কা না থাকে এবং এমন লোকের নিকট ইহা গচ্ছিত রাখিবে, যে ইহা নষ্ট না করে। কারণ, পার্থিব ধন আপদশূণ্য নহে। কিন্তু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রক্ষিত ধন নিরাপদে থাকিবে।" তিনি আরও বলেন- "দুনিয়া ও আখিরাত পরস্পর বিপরীত; ইহাদের একটিকে তুমি যে পরিমাণে সন্তুষ্ট করিবে অপরটি সেই পরিমাণে অসন্তুষ্ট হইবে।"

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাঁহার সহচরদিগকে বলেন- "তোমাদের সম্মুখে আমি দুনিয়াকে মৃত্তিকার সঙ্গে মিশাইয়া দিলাম, তোমরা আবার গ্রহণ করিও না। কারণ, ইহার এক অপবিত্রতা এই, ইহাতে আল্লাহ্‌র নাফরমানি হইয়া থাকে এবং অপর অপবিত্রতা এই, ইহা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আখিরাতে (বেহেশ্‌তে) পৌঁছিতে পারিবে না। অতএব তোমরা লোকালয়ে থাকিও না, দুনিয়ার আবাদী স্থান হইতে বাহিরে চলিয়া যাও। তোমরা ইহাও জানিয়া রাখ যে, অধিক সংসারাসক্তি এবং লোভ সমস্ত পাপের অগ্রগামী সরদার ও ইহারই ফল অসীম দুঃখ।" তিনি আরও বলেন- "আগুন ও পানি যেমন একত্র থাকিতে পারে না, সেইরূপ দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতি ভালবাসা একই হৃদয়ে একত্র হইতে পারে না, লোকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- "আপনি বাসগৃহ নির্মাণ করেন না কেন?" তিনি বলিলেন- "অন্যের পুরাতন ঘরই আমার জন্য যথেষ্ট।"

একদা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি, বিদ্যুৎ-বজ্রপাতে নিপতিত হইয়া আশ্রয়স্থলের অন্বেষণে এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করিতেছিলেন, এমন সময় অনতিদূরে একটি তাঁবু দেখিয়া তথায় গমন করিলেন। কিন্তু ইহাতে এক রমণীকে দেখিতে পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তৎপর এক পর্বতগুহার দিকে তিনি অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তথায় এক ব্যাঘ্র দেখিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং নিবেদন করিলেন- "হে খোদা, তোমার সৃষ্ট সকল প্রাণীর জন্য আশ্রয়স্থল রহিয়াছে। কিন্তু আমার জন্য কোন স্থান রাখ নাই।" তৎক্ষণাত ওহী অবতীর্ণ হইল- "আমার রহমতের গৃহ (অর্থাৎ বেহেশত) তোমার আশ্রয়স্থল। বেহেশ্‌তে একশত হূরের সঙ্গে তোমার বিবাহ করাইয়া দিব; তাহাদিগকে আমি আমার পবিত্র হস্তে সৃষ্টি করিয়াছি। তোমার বিবাহ উৎসব চারি হাজার বৎসর পর্যন্ত থাকিবে। ইহার প্রত্যেকটি দিন দুনিয়ার কয়েক জীবনকালের সমান হইবে। ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করিতে আদেশ করিব- 'হে পরহেযগার সংসার বিরাগীগণ, সকলে ঈসার (আ) বিবাহ-উৎসবে যোগদান কর। তাহারাও সকলেই উপস্থিত হইবে।"

একদা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম স্বীয় সাথিগণসহ এক শহর দিয়া যাইতেছিলেন। সেই স্থানের সমস্ত লোককে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন- "হে বন্ধুগণ, এই সমস্ত লোক আল্লাহ্‌র গযবে প্রাণ হারাইয়াছে, অন্যথা তাহারা কবরস্থ থাকিত।" তাঁহার সঙ্গিগণ বলিলেন- "কি কারণে তাহার প্রাণ হারাইল আমরা জানিতে চাই।" রাত্রিকালে ঈসা আলায়হিস্ সালাম এক উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া বলিলেন- "হে শহরবাসীগণ।" মৃতগণের একজন উত্তর দিল لَبَّيْكَ يَا رُوْحَ اللّٰه অর্থাৎ "হে রূহাল্লাহ্ (হযরত ঈসা আ), আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "তোমাদের এরূপ অবস্থা কেন?" সেই ব্যক্তি বলিল- "এক রাত্রে আমরা সুখে-শান্তিতে ছিলাম। প্রত্যূষে দেখিলাম, আমরা দোযখে আছি।" হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন- "ইহার কারণ কি?" সে নিবেদন করিল- "কারণ আমরা দুনিয়াকে ভালবাসিতাম এবং পাপীদের অনুগত থাকিতাম।" হযরত বলিলেন- "কি প্রকারে তোমরা দুনিয়াকে ভালবাসিতে?" সে বলিল- "শিশু যেমন স্বীয় জননীকে ভালবাসে (আমরা সেইরূপ দুনিয়াকে ভালবাসিতাম।) দুনিয়া লাভ করিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম, আবার হারাইলে দুঃখিত হইতাম।" হযরত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- "(তুমি ছাড়া) অপর কেহ উত্তর দেয় নাই কেন?" সে বলিল- "তাহাদের প্রত্যেকের মুখেই আগুনের লাগাম রহিয়াছে।" হযরত বলিলেন- "তাহা হইলে তুমি কিরূপে উত্তর দিতেছ?" সে নিবেদন করিল- "আমি তাহাদের সহিত থাকিতাম কিন্তু

তাহাদের কাজে যোগদান করিতাম না। শাস্তি অবতীর্ণ হইলে থাকিতাম কিন্তু তাহাদের কাজে যোগদানস করিতাম না। শাস্তি অবতীর্ণ হইলে আমিও ইহাতে পতিত হইলাম এবং আমি এখন দোযখের এক পার্শ্বে আছি। মুক্তি পাইব, না দোযখে নিক্ষিপ্ত হইব, বলিতে পারি না।" তৎপর ঈসা আলায়হিস্ সালাম স্বীয় সহচরগণকে বলিলেন- "হে ভ্রাতৃগণ, দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে যদি খারী লবণের সঙ্গে যবের রুটি ভক্ষণ করিতে হয়, চট পরিধান করিতে হয় এবং অশ্বাদি বাহনের পৃষ্ঠে রাত্রি যাপন করিতে হয়, তবুও উহা উত্তম।"

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন- "অন্যান্য লোকজন যেমন দুনিয়ার সুখ পাইলে আখিরাতের সামান্য অংশ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তোমরা আখিরাতের সুখের সহিত দুনিয়ার সামান্য অংশ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাক।" তিনি আরও বলেন- "নীচ প্রকৃতির লোকে পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়া অর্জন করে; কিন্তু দুনিয়া অর্জনে বিরত হইলেই ততোধিক পূণ্য হইত।" একদা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম তাঁহার সিংহাসনে আরোহণপূর্বক ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার খেদমতের জন্য মানুষ, জিন, নরনারী সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছিল। বনী ইসরাঈল বংশীয় 'ওব্বাদ' নামক এক আবিদের নিকট দিয়া যাইবার কালে তিনি হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে বলিলেন- "হে দাউদ-তনয়, আল্লাহ্ আপনাকে বিশাল রাজত্ব প্রদান করিয়াছেন।" হযরত (আ) বলিলেন- "মুসলমানের আমলনামার একটি তাস্‌বীহ আমার এই রাজত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ তাস্‌বীহ চিরস্থায়ী থাকিবে, আর এই রাজত্ব বিলুপ্ত হইবে।"

হাদীস শরীফে উক্ত আছে- হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বেহেশ্‌তে গন্দম খাইলে তাঁহার বাহ্যের বেগ হইল। তিনি বাহ্যের স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। আল্লাহ্ তাঁহার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠাইলেন। ফেরেশতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "আপনি কি অন্বেষণ করিতেছেন?" তিনি বলিলেন- "আমার উদরে যাহা আছে তাহা ফেলিবার স্থান অন্বেষণ করিতেছি।" ফেরেশ্‌তা বলিলেন- "আল্লাহ্ গন্দম ব্যতীত বেহেশ্‌তের কোন বস্তু আহারে এইরূপ তাসীর (কার্যকারিতা) রাখেন নাই। আপনি ইহা কোথায় ফেলিবেন, আরশ বা কুরসির উপর অথবা নদীতে বা বৃক্ষতলে ইহা ফেলা যাইবে না; এইরূপ অপবিত্র পদার্থ ফেলিবার স্থান দুনিয়া ব্যতীত আর কোথাও নাই; আপনি তথায় গমন করুন।" হাদীস শরীফে উক্ত আছে, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "আপনার এত দীর্ঘ জীবনে দুনিয়াকে আপনি কিরপ পাইলেন?" তিনি বলিলেন- "দুনিয়া যেন একটি দুই দ্বারবিশিষ্ট গৃহ, ইহার এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর দ্বার দিয়া বাহির

হইয়া আসিলাম।" লোকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করিল- "আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষাদান করুন যাহাতে আমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হইতে পারি।" তিনি বলিলেন- "দুনিয়াকে শত্রু বলিয়া গণ্য কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে আল্লাহ্ ভালবাসিবেন।"

দুনিয়া সম্বন্ধে সাহাবা ও বুযুর্গগণের উক্তি—দুনিার জঘণ্যতা সম্বন্ধে ঐরূপ আরও বহু হাদীস রহিয়াছে। এখন সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্হুম ও বুযুর্গগণের কতিপয় উক্তি উল্লেখ করা হইতেছে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "যে ব্যক্তি এই কাজগুলি করিয়াছে, বেহেশ্‌ত অন্বেষণ ও দোযখ হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে" তাহার পক্ষে আর কিছুই করিবার নাই ঃ (১) আল্লাহ্‌র জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার আদেশ-নিষেধ ঠিকভাবে পালন করিয়াছ, (২) শয়তানকে চিনিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, (৩) সত্যকে চিনিয়া দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছে, (৪) অসত্যকে বুঝিয়া বর্জন করিয়াছে, (৫) দুনিয়াকে চিনিতে পারিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, (৬) আখিরাতকে চিনিয়া ইহার অন্বেষণে তৎপর রহিয়াছে।"

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন- "আল্লাহ্ তোমাকে যে পদার্থ দুনিয়াতে দান করিয়াছেন, তোমার পূর্বেও ইহা হয়ত তিনি অন্য কাহাকেও দিয়াছিলেন এবং তোমার পরে অপর কাহাকেও আবার দিবেন। এমতাবস্থায় ইহার প্রতি আসক্ত হইতেছ কেন? সকাল-সন্ধ্যায় দুই মুষ্ঠি অন্ন ব্যতীত সংসারে আর কোন পদার্থের অংশ তোমার অদৃষ্টে নাই। ইহার জন্য নিজকে ধ্বংস করিও না। সংসারে একেবারে রোযা রাখ, আর পরকালে যাইয়া ইফতার কর। কারণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা দুনিয়ার মূলধন এবং (হাভিয়া) নামক দোযখ ইহার মুনাফা।"

এক ব্যক্তি হযরত আবূ হাযেম রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে জিজ্ঞাসা করিল- "আমি দুনিয়ার প্রতি বড় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি; কি করিলে আমার মন হইতে এই আসক্তি বিদূরিত হইবে।" তিনি বলিলেন- "যাহা কিছু অর্জন কর, হালাল উপায়ে অর্জন কর এবং যথার্থ স্থানে ব্যয় কর। (তাহা হইলে) দুনিয়ার সহিত তোমার যতটুকু ভালবাসা থাকিবে ইহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না।" ইহার তাৎপর্য এই যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন ঐ নির্দেশানুসারে চলিলে দুনিয়া স্বয়ং তাহার প্রতি বিরাগভাজন হইয়া যাইবে এবং তাঁহার নিকট দুনিয়া মন্দ বলিয়া বোধ হইবে। হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে মুআয রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "সংসার শয়তানের দোকান। তাহার দোকান হইতে কিছুই লইও না, অন্যথা অন্যায়ভাবে তোমার পিছনে লাগিবে।"

হযরত ফুযায়ল (র) বলেন- "অস্থায়ী সংসার যদি স্বর্গের হইত আর চিরস্থায়ী পরকাল মাটির হইত, তবে চিরস্থায়ী মাটিকে অস্থায়ী স্বর্গ অপেক্ষা অধিক ভালবাসা বুদ্ধিমানের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভবপর যে, তোমরা চিরস্থায়ী স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অস্থায়ী মাটি অবলম্বন করিতেছ।" হযরত আবূ হাযেম (র) বলেন- "দুনিয়া বর্জন কর। আমি শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইবে তাহাকে হাশরের মাঠে দণ্ডায়মান করাইয়া তাহার মাথার উপর হইতে ঘোষণা করা হইবে, 'আল্লাহ্ যে পদার্থকে ঘৃণা করেন, এই ব্যক্তি সেই পদার্থকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানে ভালবাসিত।"

হযরত ইব্নে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "দুনিয়াবাসী অতিথিস্বরূপ এবং যাহা কিছু তাহার নিকট আছে উহা ধার দেওয়া বস্তু। অতিথির পরিণাম প্রস্থান এবং ধার দেওয়া বস্তুর পরিণতি ফিরাইয়া লওয়া।" মহাত্মা লুকমান হাকিম নিজ পুত্রকে উপদেশ দিলেন- " হে বৎস, আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া বিক্রয় কর; তবে উভয় জগত হইতেই উপকার পাইবে। আর দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত বিক্রয় করিও না; অন্যথা উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" হযরত আবূ উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- " আল্লাহ্ রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করিলে শয়তানের সৈন্য-সামন্ত তাহার নিকট গিয়া বলিল- ' এমন রাসূল আল্লাহ্ পাঠাইলেন, এখন আমরা কি করিব?' শয়তান তাহাদিগকে জিজ্ঞাস করিল- 'আচ্ছা বলত, মানুষ দুনিয়াকে ভালবাসে কি?" তাহারা বলিল- 'হাঁ।' শয়তান বলিল- 'উদ্বিগ্ন হইও না। তাহারা মূর্তিপূজা না করে, না করুক; সংসারাসক্তিতে আমি তাহাদিগকে এইরূপ করিব যে, তাহারা যাহা গ্রহণ করিবে, অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিবে; যাহা দিবে, অন্যায়ভাবে দিবে; যাহা সঞ্চয় করিবে, অন্যায়ভাবে সঞ্চয় করিবে; আর সকল পাপ এই ত্রিবিধ কার্যের অধীনে (স্বতঃই সংঘটিত হইবে)।"

হযরত ফুযায়ল (র) বলেন- "যদি আল্লাহ্ সমস্ত দুনিয়া আমার জন্য হালাল করিতেন এবং যচ্ছোক্রমে উপভোগের জন্য আমাকে দান করিতেন এবং আমার নিকট হইতে ইহার হিসাবও গ্রহণ না করিতেন, তবুও আমি দুনিয়াকে এরূপ ঘৃণা করিতাম যেমন তোমরা মৃত প্রাণীকে ঘৃণা করিয়া থাক। হযরত আবূ ওবায়দাহ ইব্ন যার্‌রাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হু সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু তথায় গমন করিয়া তাঁহার গৃহে একটি তরবারি, একখানি ঢাল এবং একটি রেহেল (কুরআন শরীফ উপরে রাখিয়া পড়ার জন্য কাষ্ঠাধার) ব্যতীত আর কোন বস্তুই দেখিতে পাইলেন না। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-

"প্রয়োজনীয় বস্তু আপনি গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই কেন?" হযরত আবূ ওবায়দাহ্ ইব্নে যার্‌রাহ (র) বলিলেন- "যেখানে যাইতেছি (অর্থাৎ কবরে) সেখানে উহাই যথেষ্ট।"

হযরত হাসান বসরী (র) একবার হযরত ওমর ইব্নে আবদুল আযীযের (র) নিকট এক সংক্ষিপ্ত পত্রে ইহা ব্যতীত আর কিছুই লিখিলেন না- "যাহার মৃত্যু সর্বশেষে হইবে তাহার মৃত্যুর সময় সমাগত মনে কর।" (অর্থাৎ তখন পার্থিব কোন জিনিসের আবশ্যকতা থাকিবে না)। তিনি উত্তরে লিখিলেন- "যে কালে দুনিয়া সৃজন করা হয় নাই, সষ্টির পূর্বে যেমন ছিল, আমার সম্বন্ধে সেই কালই আছে; আপনি এউরূপ মনে করুন।" (অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোন জিনিস সৃজন করা হয় নাই যাহা আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে।) একজন বুযুর্গ বলেন- "যে ব্যক্তি মৃত্যুকে সত্য জানে তাহার আনন্দ প্রকাশ আশ্চর্যের বিষয়। যে ব্যক্তি দোযখকে সত্য জানে তাহার হাস্য বিস্ময়ের ব্যাপার। যে ব্যক্তি নিজেই দেখিতেছে যে, দুনিয়া কাহারও নিকট স্থায়ী হয় না, তাহার পক্ষে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া আশ্চর্যের কথা। যে ব্যক্তি তাক্‌দীরকে সত্য জানে, তাহার পক্ষে জীবিকা অর্জনে নিবিষ্ট হওয়া আশ্চর্যের বিষয়।"

হযরত দাউদ তায়ী (র) বলেন- "তওবা ও ইবাদত কার্যে তোমরা ক্রমশ শৈথিল্য করিয়া আসিতেছ আর সত্যবাদিতাকে তোমরা অকর্মণ্য করিয়া দিতেছ' তদ্দরুন তোমরা উহার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইতেছ এবং অপরে উহা দ্বারা লাভবান হইতেছে।" হযরত আবূ হাযেম (র) বলেন- "এরূপ কোন বস্তু সংসারে নাই যাহার জন্য তুমি আনন্দিত হইতে পার। অবিমিশ্র আনন্দ ত আল্লাহ্ সংসারে সৃষ্টিই করেন নাই।" হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেন- মৃত্যুর সময়ে সংসার হইতে প্রস্থানের কালে তিনটি আক্ষেপ প্রত্যেকের গলা চাপিয়া ধরিবে; যথা ঃ (১) যাহা সে সঞ্চয় করিয়াছে তাহা কখনও সে তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতে পারে নাই; (২) যত আশা ছিল তাহা পূর্ণ হইল না; (৩) পরলোক পথের পাথেয় যথাযোগ্যরূপে সঞ্চয় করা হইল না।"

হযরত মুহাম্মদ ইব্নে মুনকাদির (র) বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি আজীবন প্রত্যেক দিন রোযা রাখে, সারা রাত্রি নামায পড়ে, হজ্জ ও জিহাদ করে এবং সকল হারাম বিষয় হইতে নিরস্ত থাকে, তথাপি দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইলে কিয়ামতের দিন তাহার সম্বন্ধে বলা হইবে- 'আল্লাহ্ যে বস্তুকে ঘৃণিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ব্যক্তি সেই বস্তুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভালবাসিয়াছিল।' বল ত তখন এইরূপ ধার্মিক তপস্বীর অবস্থা কেমন হইবে? এখন ভাবিয়া দেখ আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে দুনিয়াকে ভালবাসে না এবং তদুপরি অগণিত পাপ, এমন কি

ফরয কার্যে পর্যন্ত ত্রুটি করিতেছে না? তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে?" বুযুর্গগণ বলিয়াছেন- "দুনিয়া একটি বিধ্বস্ত পান্থশালাস্বরূপ এবং যে দুনিয়া অন্বেষণে নিবিষ্ট, তাহার হৃদয় তদপেক্ষা বিধ্বস্ত। আর বেহেশ্‌ত একটি সুশোভিত ও সমৃদ্ধ আবাসস্থল এবং যে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত অন্বেষণে নিবিষ্ট তাহার হৃদয় তদপেক্ষা সুশোভিত ও সমৃদ্ধ।"

হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "তুমি স্বপ্নাবস্থায় রৌপ্য মুদ্রা পাইতে ভালবাস, না জাগ্রতাবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা পাইতে ভালবাস?" সেই ব্যক্তি বলিল- "জাগ্রতাবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা পাইতে ভালবাসি।" তিনি বলিলেন- "তুমি মিথ্যা বলিতেছ; কারণ সংসার স্বপ্ন এবং আখিরাত জাগ্রতাবস্থা, আর সংসার অর্জনেই তুমি অধিক লালায়িত।" হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে মুআয (র) বলেন- "যে ব্যক্তি দুনিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই সে নিজেই দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে, কবরে গমনের পূর্বেই সে কবরকে সমৃদ্ধ করিয়া লইতে পারে এবং আল্লাহ্‌র দীদার লাভের পূর্বেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া লইতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বুদ্ধিমান।" তিনি আরও বলেন- "দুনিয়া এত অশুভ যে, ইহার শুধু কামনাই মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে ভুলাইয়া রাখে। এমতাবস্থায়, দুনিয়া লাভ করিলে যে কি ভীষণ দুর্গতি ঘটে, তাহা কি বলিব।" হযরত বকর ইব্নে আবদুল্লাহ্ (র) বলেন- "যে ব্যক্তি পার্থিব সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করত নিজেকে অবকাশ দিবার কামনা করে, সে এমন ব্যক্তি সদৃশ যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে পরিতৃপ্ত করিয়া নির্বাপিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে শুষ্ক কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করিতে থাকে।

হযরত আলী কাররামাল্লাহ্ অজহাহু বলেন- "ছয়টি বস্তুই দুনিয়া; যথা ঃ (১) ভোজন, (২) পান, (৩) পোশাক, (৪) আঘ্রাণ, (৫) যানবাহন এবং (৬) বিবাহ। আহার্য বস্তুর মধ্যে মধু উৎকৃষ্ট, সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী ইহা সমানভাবে রহিয়াছে। পোশাকের মধ্যে রেশমী বস্তু উৎকৃষ্ট, ইহা রেশম পোকার মুখ নিঃসৃত লালা হইতে জন্মে। আঘ্রাণের বস্তুর মধ্যে কস্তুরী উৎকৃষ্ট, ইহা হরিণের রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। যানবাহনের মধ্যে ঘোড়া সর্বশ্রেষ্ঠ, মানুষ ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করে। কামনার বস্তুসমূহের মধ্যে কামিনী সর্বশ্রেষ্ঠ, কামিনী-সম্ভোগ ইহার শেষ পরিণতি। যাহা নারীকে বিভূষিত করে (অর্থাৎ সদগুণরাজি) উহাই তাহার মধ্যে উত্তম; কিন্তু তাহার মধ্যে যাহা জঘণ্যতম (অর্থাৎ কামবাসনা চরিতার্থ করিবার উপকরণ) তোমরা অন্বেষণ করিয়া থাক।"

হযরত ওমর ইব্নে আবদুল আযীয (র) বলেন- "হে মুসলমানগণ, আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা অবিশ্বাস করিলে তোমরা কাফির হইবে; আবার বিশ্বাস করিয়া ইহাকে অতি সহজ মনে করিলে তোমাদের

নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইবে। স্মরণ রাখ, আল্লাহ্ তোমাদিগকে চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু পার্থক্য এতটুকু যে, তোমাদিগকে তিনি এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে লইয়া যাইবেন।"

দুনিয়ার জঘণ্যতার প্রকৃত পরিচয়- দুনিয়ার জঘণ্যতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ভূমিকায় (অর্থাৎ দর্শন খণ্ডে) বলা হইয়াছে। এখন দুইখানা হাদীসের প্রকৃত মর্ম অবগত হওয়া উচিত। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "দুনিয়া ও যাহা কিছু দুনিয়াতে আছে তৎসমুদয়ই অভিশপ্ত; কিন্তু তন্মধ্যে যাহা আল্লাহ্‌র জন্য আছে (তাহা উৎকৃষ্ট)।" সুতরাং কোনগুলি আল্লাহ্‌র জন্য ও অভিশপ্ত নহে এবং তৎসমুদয় ব্যতীত কোনগুলি অভিশপ্ত যাহাদের ভালবাসা সমস্ত পাপের অগ্রগামী সরদার, উহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

পার্থিব পদার্থের প্রকারভেদ—পার্থিব বস্তু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী—এই শ্রেণীর বস্তুর ভিতর-বাহির সর্বতোভাবে দুনিয়া। উহা কখনও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হইতে পারে না। কারণ, উহার সমস্তই পাপ, আর পাপ সৎ উদ্দেশ্যে করিলেও পাপই থাকে। আমোদ-প্রমোদকে নির্দোষ বলিয়া মনে করিলেও উহা অভিশপ্ত দুনিয়ারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আমোদ-প্রমোদ হইতে অহঙ্কার ও গাফলত (উদাসীনতা, প্রমোদ, মোহ) জন্মে এবং অহঙ্কার ও গাফলত সমস্ত পাপের আকর।

দ্বিতীয় শ্রেণী—বাহ্য দৃশ্যে এই শ্রেণীর কাজগুলিকে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নিয়তের দোষে উহা দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ইহাও আবার তিনি ভাগে বিভক্ত, যথা ঃ (১) যিকির বা ধ্যান, (২) আল্লাহ্‌র যিকির এবং (৩) প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ। এই সমস্ত কাজ আখিরাত এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার জন্য হইয়া থাকিলেও নিয়তের দোষে দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে; যেমন মনে কর, যিকির যদি জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে হয় এবং জ্ঞান যদি ধন, প্রভুত্ব ও মান-মর্যাদা লাভ করিয়া লোকজনের ভক্তি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে; যিকিরের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, মানুষ তাহাকে সাধু লোক বলিযা সম্মান প্রদর্শন করিবে; প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, লোকে তাহাকে পরহেযগার, সংসারবিরাগী, সাধু পুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করিবে, তবে এই ত্রিবিধ কাজই দুনিয়ার অন্তর্গত হইয়া ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হইবে। কিন্তু তখনও এই কাজগুলি আকারে প্রকারে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বলিয়াই মনে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর কার্যসমূহকে বাহ্য আকৃতি-প্রকৃতিতে মানবের দৈহিক দাবি-দাওয়া মিটানোর উদ্দেশ্যে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাধু সঙ্কল্পের দরুন উহাও আল্লাহ্‌র জন্য হইয়া যাইতে পারে, তখন উহাকে আর দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

যেমন মনে কর, ইবাদতে শক্তি লাভের নিমিত্ত যদি পানাহার করা হয়, সন্তান-সন্ততি হইলে মানবজাতি রক্ষা পাইবে এবং আল্লাহ্‌র দীন জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবে, এই উদ্দেশ্যে যদি বিবাহ করা হয় এবং ইবাদতকার্যে অবকাশ লাভের আশায় ও অন্যের গলগ্রহ না হওয়ার জন্য যদি পরিমিত ধনার্জন করা হয়, তবে উহাকে যথার্থই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হইয়াছে বলা হইবে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও বাহাদুরির উদ্দেশ্যে ধনার্জন করে সে আল্লাহ্‌কে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ দেখিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের গলগ্রহ না হওয়ার জন্য ধনার্জন করে, কিয়ামত-দিবস তাহার মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে।"

অতএব যে কার্য মানবের দৈহিক দাবি দাওয়া চরিতার্থের জন্য করা হয় এবং যাহাতে পরলোকের কোনই আবশ্যকতাই নাই, উহাই দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যে কার্য দেহের জন্য করা হয়, অথচ পরকালের কার্যের মধ্যেও উহার আবশ্যকতা আছে, তেমন কার্য যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে, তবে উহা দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; যেমন, হজ্জে গমনের বাহন- পশুর খাদ্যকেও হাজীর পথখরচের মধ্যে গণ্য করা হয়।

দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত বস্তুসমূহকে 'হাওয়া' নামে অভিহিত করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ـ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

"এবং (যে-ব্যক্তি) আত্মাকে 'হাওয়া' (কুপ্রবৃত্তি) হইতে দমিত রাখিয়াছে অবশ্যই বেহেশ্‌ত তাহার বাসস্থান" (সূরা নাযিয়াত, রুজূ ২, পারা ৩০)।

অন্যত্র আল্লাহ্ দুনিয়াকে পাঁচ প্রকার পদার্থে বিভক্ত করিয়া বলেন ঃ

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই দুনিয়ার জেন্দেগানী ইহাই; যথা ঃ খেলাধুলা-কৌতুকানন্দ ও কাম্য বস্তুর সুখাস্বাদ এবং সৌষ্ঠব বর্ধন এবং নিজেদের মধ্যে অহঙ্কার ও বাহাদুরি প্রদর্শন এবং ধন ও জনের বৃদ্ধি কামনা।" (সূরা হাদীদ, রুকূ ৩, পারা ২৭) আল্লাহ্ আর একটি আয়াতে পাঁচটি দ্রব্য একত্র করিয়া বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ـ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ

অর্থাৎ "লোকের জন্য নারীদের সহিত কামপ্রবৃত্তির ভালবাসা, সন্তানের ভালবাসা, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ-রৌপ্য ভান্ডারের ভালবাসা এবং চিহ্নিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্যক্ষেত্রের ভালবাসা শোভন করা হইয়াছে; এই সকলই পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক বস্তু" (সূরা আল ইমরান, রুকূ ২, পারা ৩)।

উল্লিখিত বস্তুসমূহের মধ্যে যাহা পরকালের কার্যে আবশ্যক উহাকে পরকালের মধ্যেই গণ্য করা হয়। কিন্তু এইজন্য মানবের জীবন ধারণের নিমিত্ত যতটুকু আরাম ও আনন্দের নিতান্ত আবশ্যক উহা অপেক্ষা অধিক আরাম ও আনন্দকে কখনও পরকালের মধ্যে ধরা যাইতে পারে না।

পার্থিব বস্তু অর্জনের পর্যায়—পার্থিব বস্তু অর্জনের তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়- জীবন ধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করা। দ্বিতীয় পর্যায়- সৌষ্ঠব বর্ধনের জন্য প্রথম পর্যায় অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্জন করা। তৃতীয় পর্যায়- অতিরিক্ত সৌষ্ঠব বর্ধন, অহঙ্কার ও বাহাদুরির উদ্দেশ্যে অর্জন করা। ইহার কোন সীমা নাই; যত বাড়াইবে ততই বাড়িয়া চলিবে।

জীবনধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বেহেশ্‌তী। আর যে অতিরিক্ত সৌষ্ঠব বর্ধন, অহঙ্কার ও বাহাদুরিতে লিপ্ত সে-ই দোযখে নিপতিত হইয়াছে। আত্মগর্ব ও বাহাদুরিরও কোন সীমা নাই। প্রথম (অভাব মোচন) ও তৃতীয় (বাহাদুরি প্রদর্শন) পর্যায়ের দুইটি প্রান্ত আছে; একটি প্রান্ত অভাবের সন্নিকট ও অপরটি বাহাদুরির নিকটবর্তী। এই দুইটি প্রান্তের মধ্যস্থলে আবশ্যকতারও দুইটি ধাপ আছে এবং গভীরভাবে চিন্তা করিলেই মানুষ ইহা বুঝিতে পারে। আবশ্যকতার কোন পরিসীমা নাই। আবশ্যকতা মিটাইতে গেলেই ক্রমে ক্রমে আবশ্যকতার মাত্রা বাড়িয়া উঠে এবং যাহা নিষ্প্রয়োজন তাহাও আবশ্যকতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপেই মানুষ পরকালে হিসাব প্রদানের আশঙ্কায় নিপতিত হয়, এই জন্যই দরবেশ ও পরহেযগার ব্যক্তিগণ শুধু নিতান্ত অভাব মোচন করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকেন।

আদর্শরূপে হযরত উওয়াইস করনী (রা)—হযরত উওয়াইস্ করনী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু অল্পে তুষ্টি বিষয়ে জগতের অগ্রণী নেতা ও চিরজীবন্ত আদর্শ। দুনিয়াকে তিনি তাঁহার জন্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে উম্মাদ বলিত। তাঁহার জীবনে কখন কখন এমন হইত যে, পাড়া-প্রতিবেশিগণ ক্রমাগত দুই-এক বৎসর তাঁহার দেখা পাইত না এবং তিনি কোথায় থাকিতেন, ইহাও তাহারা জানিত না। ফজরের নামাযের আযানের সময় তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, আর ইশার নামাযান্তে গৃহে ফিরিতেন। রাস্তা হইতে খোরমার বীচি আহরণ করিয়া

তিনি আহার করিতেন। কোন দিন আহারের পরিমিত খোরমা সংগ্রহ করিতে পারিলে উহার বীচি গরীব-দুঃখীদিগকে দান করিয়া দিতেন। কোন দিন আবার খোরমার বীচি খরিদ করত উহা দ্বারা ইফতার করিতেন। নেক্‌ড়া ও ছিন্নবস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া ধৌত করত পরিধানের বস্ত্র সেলাই করিয়া লইতেন। পাগল মনে করিয়া ছোট ছোট বালকেরা তাঁহাকে পাথর ছুড়িয়া মারিত। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন- "হে বালকগণ, ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ কর যেন রক্তপাত হইয়া ওযু নষ্ট না হয়, অন্যথা আমার নামাযের ব্যাঘাত ঘটিবে।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত তাঁহার কখনও সাক্ষাত ঘটে নাই। কিন্তু হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে নিজের পোশাক প্রদানের জন্য হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে ওফাতের সময় নির্দেশ দিয়া যান।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশকালে ইরাকের কতক লোককে সমবেত দেখিয়া তাহাদিগকে দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহারা দন্ডায়মান হইলে তিনি বলিলেন- "কুফার অধিবাসিগণ উপবেশন কর।" তাহারা বসিয়া পড়িল। তৎপর তিনি আবার বলিলেন- "করনের অধিবাসী ব্যতীত আর সকলেই বস।" সকলেই বসিয়া পড়িল। মাত্র এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিল। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "তুমি কি করনের অধিবাসী?" সেই ব্যক্তি বলিল- "হাঁ।" তিনি তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- "তুমি কি উওয়াইস করনীকে চিন?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "হাঁ, তাহাকে চিনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে সে এত নির্বোধ, উম্মাদ ও দীনহীন যে, আপনার পক্ষে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করা শোভা পায় না" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তাহার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন- 'আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, রবীয়া ও মুযের সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার সমসংখ্যক লোক তাঁহার সুপারিশে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে, এইজন্য আমি তাঁহার অন্বেষণ করিতেছি।" আরব দেশে এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অত্যধিক ছিল, তজ্জন্য অগণিত বুঝাইতে হইলে তথায় ঐরূপ তুলনার রীতি প্রচলিত ছিল।"

হযরত হরম ইব্‌ন হায়্যান বলেন- "আমি হযরত উওয়াইস করনী (রা) সম্বন্ধে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর মুখে ঐরূপ প্রশংসা শুনিয়া কুফায় গমন করিলাম এবং তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম তিনি ফোরাত নদীতে ওযু ও বস্ত্র ধৌত করিতেছেন। যেরূপ নিদর্শনাবলী পূর্বে শুনিয়াছিলাম

তদনুসারে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সালাম বলিলাম। সালামের উত্তর দিয়া তিনি আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মুসাফাহার উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিতে চাহিলাম।

কিন্তু তিনি হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন। আমি বলিলাম رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا اُوَيْسُ وَغَفَرَلَكَ অর্থাৎ "হে উওয়াইস, আল্লাহ্ আপনাকে দয়া ও ক্ষমা করুন। আপনি কেমন আছেন?" তাঁহার দীনাবস্থা দর্শনে তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ ও দয়াবশত আমি অধৈর্য হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন ঃ حَيَّاكَ اللّٰهُ يَاهَرَمَ بْنَ حَيَّانٍ অর্থাৎ "হে প্রিয় ভ্রাত, হরম ইব্ন হায়্যান, আল্লাহ্ তোমাকে জীবন দান করুন; তুমি কেমন আছ? কে তোমাকে আমার ঠিকানা ও পরিচয় বলিয়া দিল?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম– "আমার ও আমার পিতার নাম আপনি কিরূপে জানিলেন? কখনও ত আমাকে আপনি দেখেন নাই।" তিনি উত্তর দিলেন– نَبَّانِىَ الْعَلِمُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ "যাঁহার জ্ঞানের অগোচরে কিছুই নাই, তিনি আমাকে জানাইয়াছেন।' আর তোমার আত্মাকে আমার আত্মা চিনিয়াছে। কারণ, মুসলমানগণের পরস্পরের আত্মায় বন্ধুত্ব রহিয়াছে যদিও একজনের সহিত অপরজনের সাক্ষাত না ঘটে।"

আমি নিবেদন করিলাম– 'রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন বাণী আমাকে শুনাইয়া দিন, যেন ইহা আমার নিকট স্মারক হইয়া থাকে।' উত্তরে তিনি বলিলেন– "আমার দেহ ও প্রাণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য উৎসর্গ হউক। আমি তাঁহার দর্শন লাভ করি নাই, তাঁহার হাদীস অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। আমি রাবী (হাদীস-বর্ণনাকারী) মুহাদ্দিস (হাদীস-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ), মুফ্‌তী (ধর্ম-ব্যবস্থা দাতা) এবং উপদেষ্টা হইতে চাই না। এরূপ গুরুতর কাজে আমি নিবিষ্ট আছি যে, অপর কোন কাজে মনোনিবেশ করার অবকাশ আমার নাই।' আবার আমি নিবেদন করিলাম– 'কুরআন শরীফের কোন আয়াত পাঠ করুন। আপনার মুখ হইতে কিছু শ্রবণ করিবার আমার প্রবল বাসনা রহিয়াছে; আমার মঙ্গলের জন্য দোআ করুন এবং আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন, আল্লাহ্‌র জন্য আপনাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি।' ফোরাত নদীর তীরেই তখন তিনি আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ। অর্থাৎ "বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি" এবং ইহা বলিয়াই তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তৎপর তিনি বলিলেন– 'আমার প্রভুর কথা সত্য। খাঁটি সত্য। তিনি বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ـ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থাৎ "এবং আস্‌মান ও যমীন এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে (উহা) আমি খেল্-তামাশার জন্য সৃষ্টি করি নাই। সত্য ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য আমি (তৎসমুদয়) সৃষ্টি করি নাই। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক (উহা) বুঝে না....'নিশ্চয় তিনি প্রবল, দয়ালু" (সূরা দুখান, রুকু ২, পারা ২৫)। এই পর্যন্ত আবৃত্তি করত তিনি এমন চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, আমার মনে হইল, তিনি বেহুশ হইয়া পড়িয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পর তিনি বলিলেন– 'হে হায়্যান তনয়, তোমার পিতা পরলোক গমন করিয়াছে, অনতিবিলম্বে তুমিও পরলোকগমন করিবে, বেহেশত বা দোযখে যাইতে হইবে। তোমার দাদা হযরত আদম আলায়হিস সালাম পরলোকগমন করিয়াছেন। হযরত হাওয়া আলায়হাস্ সালাম মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম প্রস্থান করিয়াছেন; হযরত মূসা কালীমুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম পরলোকগমন করিয়াছেন। হযরত দাউদ খলীফাতুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম প্রস্থান করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করিয়াছেন, তাঁহার খলীফা আবূ বকর রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হুও প্রস্থান করিয়াছেন, আর আমার প্রিয় ভাই এবং বন্ধু ওমর রাযিয়াল্লাহ্ আনহুও চলিয়া গেলেন; হায় ওমর! হায় ওমর!"

আমি বলিলাম– 'হে উওয়াইস, আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া বর্ষণ করুন, হযরত ওমর ত পরলোকগমন করেন নাই।' তিনি বলিলেন– 'আমার আল্লাহ্ আমাকে খবর দিলেন যে, ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু পরলোকগমন করিয়াছেন।' তৎপর তিনি বলিলেন– 'আমি এবং তুমি মৃতদের অন্তর্গত।' তখন তিনি রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিলেন এবং সামান্য দোয়া করিলেন। তৎপর তিনি আবার বলিলেন– 'উপদেশ চাহিলে শোন, আল্লাহ্‌র কিতাব ও সৎলোকদের পথ অবলম্বন করিয়া চলিও। মৃত্যুর স্মরণ হইতে এক মুহূর্তও গাফিল থাকিও না। স্বীয় কওমের নিকট যখন প্রত্যাগমন করিবে, তখন তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিও। মানবজাতিকে উপদেশ দানে নিরস্ত থাকিবে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুকূলে থাকিও। ইহার বাহিরে একপদও সরিয়া যাইও না। অন্যথা ধর্মহীন লোকদের ন্যায় দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।' তিনি আবার বলিলেন– 'হে ইব্ন হায়্যান, তুমিও আমাকে আর দেখিবে না, আমিও তোমাকে আর দেখিতে পাইব না। প্রার্থনা যোগে তুমি আমাকে স্মরণ করিও এবং তোমার কথা স্মরণ হইলে আমিও তোমার জন্য

দোয়া করিব। তুমি এখন এইদিকে গমন কর; আমি ঐদিকে গমন করি।' বাসনা ছিল, আরও কিছুকাল তাঁহার সঙ্গ করি, তাহা তিনি দিলেন না, বরং তিনি নিজেও কাঁদিলেন এবং আমাকেও কাঁদাইলেন। তাঁহার পশ্চাতে আমি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলাম; তিনি এক সঙ্কীর্ণ পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ইহার পর তাঁহার আর কোন সংবাদ পাই নাই।"

পথের সন্ধান—দৃঢ় বিশ্বাস কর, যাঁহারা দুনিয়ার আপদসমূহ সম্যকরূপে চিনিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন ধারণ প্রণালী ও স্বভাব-চরিত্র হযরত উওয়াইস করনী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর ন্যায় ঐরূপই হইয়া থাকে। উহাই আম্বিয়া (আ) ও ওলিগণের (র) অবলম্বিত পথ। এই পথে যাঁহারা অনুগমন করেন বাস্তবপক্ষে তাঁহারাই দরবেশ, পরহেযগার ও পরিণামদর্শী। তুমি এই উন্নত সোপানে উপনীত হইতে না পারিলে ন্যূনকল্পে নিতান্ত আবশ্যক অভাব পূর্ণ করিয়াই বিরত হও। আমোদ-প্রমোদ এবং বিলাসিতার পথ কখনও অবলম্বন করিও না; অন্যথা পরকালে কঠোরতম বিপদে নিপতিত হইবে।

দুনিয়ার অবস্থা বর্ণনা এতটুকুই যথেষ্ট মনে করি। এতদ্ব্যতীত অত্র গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মালের মহব্বত, ধনাসক্তির প্রতিকার ও কৃপণতার বিপদসমূহ

ধনাসক্তি, কৃপণতা এবং দানশীলতা

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, দুনিয়া বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। ইহার এক শাখা ধন-সম্পদ এবং অপর শাখা সম্মান ও প্রভুত্ব। ইহা ছাড়া দুনিয়ার আরও বহু শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ধনাসক্তি যত অনিষ্টকর এইরূপ অনিষ্টকর আর কোনটিই নহে। মহাপ্রভু আল্লাহ্ ইহাকে 'আকাবা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন তিনি বলেন- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا الخ "পরে সে গিরিসংকট অতিক্রম করিল না এবং তুমি কি জান যে, গিরিসংকট কি? (তাহা হইল) কোন গোলাম আযাদ করা বা ক্ষুধাময় দিনে পিতৃহীন আত্মীয়কে কিংবা যে দরিদ্র মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহাকে খাদ্য দান করা" (সূরা বালাদ, ১ রুকূ, ৩০ পারা)। ধনাসক্তি ছিন্ন করত পর দুঃখ মোচনে অর্থ ব্যয় করা বড় দুষ্কর; এই জন্যই ইহাকে কঠিন গিরিসংকট (অর্থাৎ অতি কঠিন কর্তব্য) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ধনের আবশ্যকতা ও ইহার আধিক্যের কুফল,

ধন ব্যতীত মানব জীবন ধারণ করিতে পারে না। কারণ ইহাই তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরকালের পাথেয় অর্জনের উপকরণ। আহার, পোশাক ও বাসস্থান মানব জীবনের অপরিহার্য বস্তু এবং ধনের বিনিময়েই এই সমস্ত লাভ করা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ বস্তুর অভাবে মানুষ ধৈর্যহীন হইয়া পড়ে। আবার অতিরিক্ত ধনার্জনও বিপদশূন্য নহে এবং সম্পূর্ণরূপে নির্ধন হইলেও অভাবের তাড়নায় মানুষের পক্ষে কাফির হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে অতিরিক্ত ধন লাভে ধনী হইলেও মানব হৃদয়ে গর্ব এবং অহংকার দেখা দেওয়ার ভয় রহিয়াছে।

দরিদ্রের দ্বিবিধ অবস্থা—দরিদ্রের অবস্থা দ্বিবিধ। **প্রথম**- লোভ ও **দ্বিতীয়**- অল্পে তুষ্টি। অল্পে তুষ্টি সৎ-স্বভাবের অন্তর্গত। লোভী ব্যক্তির অবস্থাও দুই প্রকার। **প্রথম**- অন্যের দ্রব্যে লোভ করা ও **দ্বিতীয়**- স্বীয় পরিশ্রমে ধনার্জন করা। স্বীয় অর্জিত ধনে জীবিকা নির্বাহ করা প্রশংসনীয়।

ধনীর দ্বিবিধ অবস্থা—ধনীগণও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। **প্রথম**- কৃপণ ও **দ্বিতীয়**- দানশীল। কৃপণতা অত্যন্ত জঘণ্য দোষ। ধন ব্যয়েরও দুইটি অবস্থা রহিয়াছে। **প্রথম**- অপচয় ও **দ্বিতীয়**- মিতব্যয়। অপচয় নিতান্ত মন্দ। এই সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া সকলের

পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য; কারণ ধনের উপকারিতা ও অপকারিতা উভয়ই রহিয়াছে। এইজন্য প্রত্যেকের পক্ষেই ইহার জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন যাহাতে সে অনিষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে এবং উপকারী অবস্থায় ইহা অর্জনে সমর্থ হয়।

ধনাসক্তির কদর্যতা– আল্লাহ্ বলেন–

لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ ..... هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

"তোমাদের ধন ও তোমাদের সন্তানাদি যেন আল্লাহ্র স্মরণ হইতে তোমাদিগকে ভুলাইয়া না রাখে এবং যাহারা ইহা করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকুন, ২ রুকূ, ২৮ পারা) রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "বৃষ্টি যেমন সবুজ তৃণরাজি জন্মায় ধনাসক্তি এবং প্রভুত্ব-প্রিয়তা তদ্রুপ মানব অন্তরে কপটতা জন্মাইয়া থাকে।" তিনি আরও বলেন– "ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা মুসলমানের ধর্মের যেরূপ বিনাশ সাধন করিয়া থাকে দুইটি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র ছাগলের পালে এত অধিক বিনাশ সাধন করিতে পারে না।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আপনার উম্মতের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি নিকৃষ্ট?" তিনি বলিলেন– "ধনী ব্যক্তি।" তিনি আরও বলেন– "আমার (তিরোধানের) পর এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে; তাহারা নানা প্রকার সুস্বাধু খাদ্য ভক্ষণ করিবে, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, সুন্দরী রমণী রাখিবে এবং বহুমূল্য অশ্বে আরোহণ করিবে; অল্পে তাহারা পুরিতুষ্ট হইবে না, তাহাদের প্রতিটি কর্ম দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই হইবে। আমি, মুহাম্মদ, তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি– 'তোমাদের সন্তানাদির মধ্যে কেহ সেই সম্প্রদায়ের সাক্ষাত লাভ করিলে সে যেন তাহাদিগকে সালাম না দেয়, তাহাদের রুগ্ন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য যেন গমন না করে, তাহাদের জানাযায় যেন হাত না লাগায় এবং তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে যেন সম্মান প্রদর্শন না করে। এই উপদেশ যে অমান্য করিবে সে যেন ইসলামের বিনাশ সাধনে তাহাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হইবে।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়াদারদের হাতেই থাকিতে দাও; কেননা অভাব মোচন হইতে পারে ইহার অধিক সম্পদ যে ব্যক্তি অর্জন করে, ইহা তাহার ধ্বংসের কারণ হইবে, অথচ সে ইহা বুঝিতে পারিবে না।" তিনি অন্যত্র বলেন– "লোকে সর্বদা দাবী করিতে থাকে– 'আমার ধন, আমার ধন।' অনুধাবন কর, ইহা ব্যতীত তোমার কি আছে যে, তুমি যাহা আহার কর তাহা নষ্ট করিয়া দাও, যাহা পরিধান কর তাহা অকেজো করিয়া ফেল, যাহা দান কর তাহা চিরস্থায়ী থাকে।" এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল– "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, ইহার কি কারণ যে, আমি মরণের সম্বল সংগ্রহ করিতে পারি নাই।?" তিনি বলিলেন– "তোমার ধন আছে কি?" সেই ব্যক্তি বলিল– "হাঁ, আছে।" তিনি বলিলেন– "ইহা তোমার পূর্বে পাঠাইয়া দাও।" অর্থাৎ ধন

দীন-দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দাও; কারণ, মানব মন ধনে আবদ্ধ থাকে। দুনিয়াতে ধন সঞ্চয় করিলে সেও দুনিয়াতে থাকিতে চায়; আর দান-খয়রাতে ধন পরলোক পাঠাইয়া দিলে সে নিজেও পরলোকে যাইতে উদগ্রীব হইয়া উঠে।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "মানুষের তিন প্রকার বন্ধু আছে। এক (প্রকার বন্ধু) মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধুত্ব রক্ষা করে, দ্বিতীয়, কবরের দ্বার পর্যন্ত তাহার সঙ্গে চলে এবং তৃতীয়, কিয়ামত পর্যন্ত তাহার সঙ্গে থাকে। যে বন্ধু মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধুত্ব রক্ষা করে, ইহা ধন; যে কবরের দ্বার পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে চলে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন এবং যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহার সঙ্গে থাকে, ইহা তাহার আ'মাল (অর্থাৎ কর্মফল)।" তিনি আরও বলেন– "মানুষ পরলোকগমন করিলে লোকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে (পরকালের জন্য) অগ্রে কি (সৎকর্ম) প্রেরণ করিয়াছে।" তিনি আরও বলেন– "জমিদারী ও দুনিয়া অর্জন করিও না; অন্যথায় তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবে।"

হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে তাঁহার সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– "পানির উপর দিয়া আপনি হাঁটিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু আমরা পারি না; ইহার কারণ কি?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– "তোমাদের অন্তরে কি স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রতি আসক্তি নাই?" তাহারা নিবেদন করিলেন– "হ্যাঁ, আছে।" তিনি বলিলেন– "আমি উহাকে মৃত্তিকাতুল্য মনে করিয়া থাকি।"

ধনাসক্তির জঘণ্যতা সম্পর্কে বুযুর্গগণের উক্তি—এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হুর প্রতি অত্যাচার করিলে তিনি নিবেদন করিলেন–

"হে খোদা, এই ব্যক্তিকে (অত্যাচারীকে) দীর্ঘায়ু ও প্রচুর ধন দান কর।" তিনি ইহাকে নিকৃষ্ট দোয়া বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কারণ সেই ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও প্রচুর ধন লাভ করিলে অহংকার ও পরকালের প্রতি অমনোযোগিতায় স্বতঃই বিনষ্ট ও ধ্বংস হইয়া যাইবে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু একটি রৌপ্য মুদ্রা হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন– "তুই এমন পদার্থ যে, তুই যেই পর্যন্ত আমার হাত হইতে চলিয়া না যাইবি, সেই পর্যন্ত আমি উপকার পাইব না।" হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– "আল্লাহ্র শপথ, যে ব্যক্তি ধনাসক্ত হইবে আল্লাহ্ তাহাকে হেয় ও অপমানিত করিবেন।" বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রস্তুত হইলে শয়তান একটি মুদ্রা লইয়া তাহার নয়নে স্পর্শ করাইয়া বলিল– "যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আসক্ত হইবে, বাস্তবপক্ষে সে আমার গোলাম।" হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন মুয়ায রাযিআল্লাহ্ আন্হু বলেন– "ধনসম্পদ বিচ্ছুতুল্য। যে পর্যন্ত ইহার বিষের প্রতিষেধক সম্বন্ধে অবগত না হইবে সেই পর্যন্ত ইহা স্পর্শ করিও না। অন্যথায় ইহার বিষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "ইহার প্রতিষেধক কি?" তিনি বলিলেন– "হালাল (বৈধ) উপায়ে ধনার্জন করা ও শরীয়তের নির্দেশানুসারে যথাস্থানে ব্যয় করা।"

হযরত ওমর ইব্‌ন আব্দুল আযিয রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে সালমা ইব্‌ন আবদুল মালিক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন– "হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এইরূপ কাজ করিলেন যাহা কেহ কখনও করে নাই; আপনার তেরজন পুত্র, তাঁহাদের জন্য আপনি এক কপর্দকও রাখিয়া গেলেন না।" তিনি বলিলেন– "আমাকে একটু উঠাইয়া বসাও।" তাঁহাকে তুলিয়া বসাইলে তিনি বলিলেন– "মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর; আমি ত তাহাদের ধন অপরকে প্রদান করি নাই বা অপরের ধন তাহাদিগকে দেই নাই। আমার পুত্রগণ হয়ত উপযুক্ত ও আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ হইবে বা অনুপযুক্ত হইবে। যে উপযুক্ত হইবে তাহার জন্য ত আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আর যে অনুপযুক্ত হইবে সে যে কোন বিপদেই আক্রান্ত হউক না কেন, তাহার জন্য আমার কোন ভাবনা নাই।" হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুয়ায রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–

"ধনী ব্যক্তি মৃত্যুকালে দুটটি বিপদের সম্মুখীন হইবে; এইরূপ বিপদে আর কেহই পতিত হইবে না। প্রথম– তাহার সমস্ত ধন তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইবে এবং দ্বিতীয়– সমস্ত ধনের হিসাব তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে।"

ধনের উপকারিতা ও ইহার কারণ

প্রথম কারণ—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, কতিপয় কারণে ইহাকে ভাল বলা যাইতে পারে। ধনে মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আল্লাহ্‌ ইহাকে 'খায়র' অর্থাৎ ভাল বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন; যেমন তিনি বলেন– اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ الاية "ওসিয়ত করিয়া যদি মঙ্গল (ধন) রাখিয়া যায়।' (সূরা বকর, ২২ রুকূ, ২ পারা।) রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "সৎলোকের জন্য ধন ভাল বস্তু।" তিনি আরও বলেন– كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا অর্থাৎ "দরিদ্রতায় মানুষের কাফির হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।"

অভাবগ্রস্তকে শয়তানের প্ররোচনা—কোন অন্নহীন দরিদ্র অপরকে অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী দেখিতে পাইলে শয়তান তখন তাহাকে পথভ্রান্ত করিতে তৎপর হয় এবং তাহার অন্তরে এইরূপ প্ররোচনা দিতে থাকে– 'আল্লাহ্‌র অবিচার দেখ। তিনি পাপিষ্ঠ দুরাচারকে এত ধন দান করিয়াছেন যে, সে ইহার পরিমাণ পর্যন্ত করিতে পারে না। আর তোমার ন্যায় অসহায় দরিদ্রকে তিনি অনশনে মারিতেছেন; তোমাকে একটি মুদ্রাও দান করেন নাই। তোমার অভাব ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি অবগত না থাকিলে তাহার জ্ঞানে অপূর্ণতা রহিয়াছে। আর তিনি এই সম্বন্ধে অবগত এবং দানে সমর্থ হইয়াও তোমার অভাব মোচনার্থ ধন-সম্পদ দান না করিলে তাঁহার দান ও দয়ায় অসম্পুর্ণতা রহিয়াছে। আর যদি মনে কর যে, পরকালে ইহার প্রতিফল দিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি তোমাকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছেন, তবে অনুধাবন কর,

ইহকালে কষ্টে নিপতিত না করিয়াও ত তিনি তোমাকে পরকালে অনন্ত সুখ দান করিতে পারিতেন। এমতাবস্থায়, তিনি তোমার অভাব মোচন করিতেছেন না কেন? আর ইহকালে কষ্ট ভোগ ব্যতীত তিনি কাহাকেও পরকালে সুখ দানে অক্ষম হইলে তাঁহার ক্ষমতা অপূর্ণ।" সুতরাং এবং বিধ প্ররোচনার ফলে আল্লাহ্‌ পরম দয়ালু, দানশীল ও উদার, তাঁহার অফুরন্ত ধন-ভান্ডার সম্পদে ভরপুর; কিন্তু কোন্‌ শুভ উদ্দেশ্যে প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি নিখিল বিশ্বকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত রাখিতেছেন, এই কথাগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করা দুষ্কর।

অদৃষ্টের গূঢ় রহস্য সকলের নিকটই গোপনীয় রহিয়াছে। কিন্তু শয়তান এই সুযোগে মানবের অন্তরে অদৃষ্ট সম্পর্কে নানারূপ কুমন্ত্রণা উপস্থাপিত করার অবকাশ পায় এবং তাহাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ভাগ্যলিপির প্রতি ক্রুদ্ধ করিয়া তোলে। তখন দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত মানব আকাশ ও কালকে গালি দিতে আরম্ভ করে এবং বলে– "আকাশ নির্বোধ ও কাল উলটা হইয়া পড়িয়াছে; ইহারা অপদার্থ ও দুরাচারকে সম্পদশালী করিতেছে এবং নিখিল বিশ্বকে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত রাখিতেছে।" এইরূপ ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে যে, আকাশ ও কাল আল্লাহ্‌র ক্ষমতাধীন; আর সে যদি ইহা অস্বীকার করে তবে তাহাকে কাফির হইতে হয়। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ "তোমরা কালকে মন্দ বলিও না; কারণ আল্লাহ্‌ই কাল।" এই হাদীসের মর্ম এই যে, যাহাকে তোমরা স্বীয় ক্রিয়া-কলাপের কারণ বলিয়া মনে কর এবং যাহাকে 'কাল' নামে অভিহিত কর বাস্তবিক পক্ষে উহা (কাল নহে, বরং) খোদা। এমতাবস্থায়, দরিদ্রতাই বেঈমান হওয়ার হেতু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যাহার ঈমান খুব দৃঢ় ও প্রবল এবং যে দরিদ্রতায় নিপীড়িত হইয়াও আল্লাহ্‌র উপর অসন্তুষ্ট হয় না ও ইহাতেই তাহার মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করে, দরিদ্রতা এমন ব্যক্তির ঈমান নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু সাধারণত মানুষ এত দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয় না। সুতরাং অভাব মোচনের পরিমিত ধনার্জন করা উত্তম। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ধনকে ভাল বস্তুর মধ্যে গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয় কারণ—পরকালের সৌভাগ্য বুযুর্গগণের পরম লক্ষ্য। কিন্তু তিন প্রকার সম্পদ ব্যতীত এই সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। প্রথম প্রকার, আত্মার সহিত বিজড়িত; যেমন– জ্ঞান ও সৎস্বভাব। দ্বিতীয় প্রকার, দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট; যথা– স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। তৃতীয় প্রকার, মন ও দেহের বাহিরে অবস্থিত। ইহা নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ; আর ইহা হইল ধন। ধনের মধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্য নিকৃষ্ট। ধনে কিন্তু সাক্ষাতভাবে কোন উপকারিতা নাই। তবে ইহা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের উপকরণ মাত্র। কারণ, উহার বিনিময়ে অন্ন-বস্ত্র সংগৃহীত হয়। দেহ রক্ষার জন্য অন্ন-বস্ত্র অপরিহার্য। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সমূহ ধারণের নিমিত্ত দেহের আবশ্যক। আবার বুদ্ধি ও লজ্জা সংরক্ষণের জন্য

ইন্দ্রিয়সমূহ যন্ত্রস্বরূপ। অপিচ হৃদয়ে উজ্জ্বল প্রদীপরূপে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যেই বুদ্ধির আবির্ভাব। আত্মা উক্ত প্রদীপের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র দর্শন ও যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে পারে। আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচয়ই সৌভাগ্যের বীজ। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক বস্তুরই চরম লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্। তিনি যেমন আদি, তেমনি অন্ত। আর বিশ্বের সকল পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহার অস্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে সে আল্লাহ্‌র পথে চলিবার জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক সেই পরিমাণ ধন পাইয়া সন্তুষ্ট থাকে এবং তদতিরিক্ত ধন হলাহল বিষ জ্ঞানে বর্জন করে। পার্থিব সম্পদ সৎলোকের জন্য ভাল এবং এই কারণেই রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "হে আল্লাহ্, মুহাম্মদের পরিজনের জীবিকা পরিমিতরূপে দান করিও।" তিনি সম্যকরূপে অবগত ছিলেন যে, অতিরিক্ত ধন লাভ করিলে মানুষ ধ্বংস ও পথভ্রষ্ট হইয়া যায় এবং নিতান্ত অভাব মোচনের পরিমিত ধন না পাইলেও তাহার ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ইহাও তাহার ধ্বংসের কারণ হয়। এইজন্যই হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উক্তরূপ দোয়া করিয়াছিলেন। অতএব যে ব্যক্তি এই বিষয়ে অবগত হইয়াছে সে কখনও ধনাসক্ত হয় না। কারণ, কেহ কোন পদার্থকে কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপকরণস্বরূপ অবলম্বন করিলে সে কখনও এই উপকরণের প্রতি আসক্ত হয় না; বরং সে বাস্তবপক্ষে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই উদ্‌গ্রীব ও তৎপর থাকে। (খোদা-প্রাপ্তিই মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে ধন অন্যতম নিকৃষ্ট উপকরণ মাত্র।)

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "স্বর্ণ-রৌপ্যের অনুরক্ত দাস অন্ধ হইয়া থাকে।" যে ব্যক্তি যে পদার্থের অনুসরণ করে সে তাহারই দাস এবং অনুসৃত পদার্থটি তাহার পূজনীয় হইয়া পড়ে। এই জন্যই হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম বলেন– وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ "আর আমাকে ও আমার সন্তানগণকে মূর্তিপূজা হইতে নিবৃত্ত রাখ।" (সূরা ইবরাহীম রুকূ ৬, ১৩ পারা)। বুযুর্গগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'মূর্তি' শব্দ ধনস্বরূপ স্বর্ণ-রৌপ্য অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন; কারণ সমস্ত লোক ধনেই নিবিষ্ট রহিয়াছে এবং নবীগণের (আ) মরতবা এত উচ্চ যে, তাঁহাদের দ্বারা মূর্তিপূজার আশঙ্কা মোটেই নাই। (কাজেই উল্লিখিত আয়াতে 'মূর্তি' অর্থে ধন বুঝাই সমীচীন'।)

ধনের উপকারিতা

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, ধন সর্প সদৃশ; ইহাতে বিষ ও বিষবিনাশক উপকরণ উভয়ই রহিয়াছে। বিষ হইতে বিষনাশক উপকরণ পৃথক না করিলে ধনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে না। এইজন্য ইহার উপকারিতা ও অপকারিতা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হইতেছে। ধনে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকারিতা

রহিয়াছে। ধনের পার্থিব উপকারিতা সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছে; সুতরাং ইহা বর্ণনার আবশ্যকতা নাই।

ধনের পারলৌকিক উপকারিতা– ইহা তিন প্রকার।

প্রথম উপকারিতা—ইবাদত কার্যে বা ইবাদতের প্রস্তুতি কার্যে নিজের জন্য ব্যয় করা। হজ্জ, জিহাদ ও এবং বিবিধ কার্যে যে অর্থ ব্যয় হয়, ইহা প্রকৃত ইবাদতেই ব্যয়িত হইল বলিয়া গণ্য হয়। ইবাদতের জন্য অবকাশ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে নিতান্ত আবশ্যক অন্ন-বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে পরিমিতরূপে যে অর্থ ব্যয় হয়, ইহাও প্রকৃত ইবাদতেই পরিগণিত। অপরপক্ষে, যাহার নিতান্ত অভাব মোচনের পরিমিত ধন নাই, সে দিবারাত্র ইহার অন্বেষণেই ব্যাপৃত থাকিবে; সুতরাং সে ইবাদতের প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র যিকির ও ধ্যান হইতে বঞ্চিত থাকে। অতএব, ইবাদতের জন্য অবকাশ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে অভাব মোচন হইতে পারে, এই পরিমাণ ধনার্জন করাও প্রকৃত ইবাদত। ইহা ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহাকে পার্থিব বলা চলে না।

এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংকল্পের পরিবর্তনে ধনের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। পারলৌকিক কার্যে অবসর লাভের উদ্দেশ্যে অভাব মোচনের পরিমিত ধন পরকালের পাথেয় এবং সম্বলস্বরূপ। তবে যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন আছে কেবল তেমন ব্যক্তিই ইহার মর্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। কারণ, উপজীবিকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া ধর্ম-পথে চলার পক্ষে কতটুকু সহায়ক সে-ই ইহা অবগত আছে।

দ্বিতীয় উপকারিতা—দান। ইহা চারি প্রকার। **প্রথম**- সদকা। ইহ-পরকালে ইহার পুণ্য অত্যন্ত বেশী। কারণ, ইহাতে গরীব-দুঃখীদের দোয়ার বরকত লাভ হয় এবং দানের সাহসিকতার প্রতিক্রিয়া দাতার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থহীন লোক এই কল্যাণ লাভে বঞ্চিত থাকে। **দ্বিতীয়**- সৌজন্য ও দয়া প্রদর্শন, ধর্মবন্ধুদের সহিত সদ্ব্যবহার, উপহার ও উপঢৌকনাদি প্রদান, তাহাদের শোকে-দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন এবং জনসাধারণের প্রতি যে কর্তব্য রহিয়াছে ইহা সম্পন্ন করা উহার অন্তর্ভুক্ত। তাহারা ধনবান হইলেও তাহাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তুমি যদি প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহাদিগকে উপঢৌকনাদি প্রদান কর, তবে মহাকল্যাণ লাভ করিবে এবং এইরূপে তুমি বদাণ্যতারূপ সৎস্বভাব অর্জন করিবে। বদাণ্যতা একটি মহৎ গুণ। যথাস্থানে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইবে। **তৃতীয়**- স্বীয় সম্মান রক্ষার্থে দান। কবি ও অতি লোভী ব্যক্তিদিগকে দান ইহার অন্তর্গত। কিছু না পাইলে এইরূপ লোকেরা অপরের কুৎসা ও নিন্দাবাদ করিতে থাকে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "লোকের নিন্দা হইতে স্বীয় সম্মান রক্ষার্থ যাহা (ব্যয়িত হয়) তাহা সদকার

মধ্যে পরিগণিত।" ইহার কারণ এই যে, অর্থপ্রদানে দুরাচারিদিগকে কুবাক্য প্রয়োগ ও নিন্দাবাদ হইতে নিরস্ত রাখা যাইতে পারে এবং দাতার মনের প্রশান্ত ভাব এবং শান্তিও অক্ষুণ্ন থাকে। কিছু দান করত তাহাদিগকে বশীভূত না করিলে তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারে, এইরূপে তখন শত্রুতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ধন ব্যতীত এইরূপ আপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় না। **চতুর্থ-** অপরের দ্বারা সাধারণ কাজগুলি করাইয়া লইবার জন্য পারিশ্রমিক প্রদান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি তাহার সমস্ত কর্ম স্বীয় হস্তেই সম্পন্ন করিতে চায়, তাহার জীবনের বহুমূল্য সময় তুচ্ছ কাজেই অপচয় হইয়া যায়। আল্লাহ্‌র যিকির ও ধ্যান করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। ইহা একের পক্ষ হইতে অপরে সমাধা করিতে পারে না। কিন্তু একের ক্রয়-বিক্রয়, বস্ত্রাদি ধৌত করা ইত্যাদি অপরে সম্পন্ন করিতে পারে। অতএব, যাহা অপরের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর এমন কাজে স্বয়ং লিপ্ত না হইয়া নিজে আরও উচ্চতর কাজ-যিকির-ফিকিরে নিরত থাকিবে। অন্যথায়, পরকালে উক্তরূপ তুচ্ছকাজে সময় অপচয়ের দরুন তোমাকে ভীষণ পরিতাপ করিতে হইবে। কারণ, জীবন নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, মৃত্যু সন্নিকটে, পরকালের পথ অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ইহার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাথেয় আবশ্যক। মানুষের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস এক একটি অমূল্য রত্ন। সুতরাং যে সমুদয় কাজ অপরের দ্বারা করাইয়া লওয়া সম্ভবপর ইহাতে স্বয়ং লিপ্ত না হইয়া বরং পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কার্যে তাহার নিবিষ্ট থাকা উচিত। আর ঐ সকল কাজ অপরে দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লওয়া আবশ্যক। তবে ধন ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। শ্রমিকদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলেই উক্তরূপ পরিশ্রমের কাজ হইতে সে অব্যাহতি পাইতে পারে; কেননা অর্থের লোভেই তাহারা অপরের কাজ করিয়া থাকে।

নিজের সমুদয় কাজ স্বীয় হস্তেই সম্পন্ন করা পুণ্য কাজ বটে। কিন্তু যাহারা শারীরিক ইবাদতে লিপ্ত ইহা তাহাদের কাজ, যাহারা উচ্চ শ্রেণীর মানসিক ইবাদতে নিবিষ্ট ইহা তাহাদের কাজ নহে। তবে যে সকল কামিল ব্যক্তি উচ্চ শ্রেণীর মানসিক যিকির-ফিকিরের যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্যান্য সমদুয় কাজ অপরের সম্পন্ন করা উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা শারীরিক ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানসিক ইবাদতে নিজেদের সম্পূর্ণ সময় নিয়োগ করিবার অবকাশ পাইতে পারেন।

তৃতীয় উপকারিতা—সদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ যে কার্যে অবিরাম পুণ্য হইতে থাকে, এইরূপ স্থানে ব্যয় করা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা ব্যক্তি বিশেষের জন্য দান নহে; বরং জনসাধারণের মঙ্গলজনক কার্যে ধন ব্যয় করা, যেমন- পুল, পান্থশালা, মসজিদ, হাসপাতাল নির্মাণ, গরীব-দুঃখীদের জন্য ধন-সম্পদ ওয়াক্‌ফকরণ ইত্যাদি। এই প্রকার কাজগুলি যতদিন বর্তমান ও প্রচলিত থাকে, ততদিন দাতা উহার পুণ্য পাইতে থাকে। এইরূপ সদকায়ে জারিয়ার কাজও ধন ব্যতীত হইতে পারে না।

ধনের পার্থিব উপকারিতা—পারলৌকিক কার্যে ধনের উপকারিতা উপরে বর্ণিত হইল। ইহার পার্থিব উপকারিতা সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছে। ধনের কারণেই মানুষ সমাজে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহার জন্যই লোকে তাহার গলগ্রহ হইয়া থাকে। ধন লাভ করিলেই মানুষ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে পারে। ইহার কল্যাণেই বহু ধর্ম-ভ্রাতাকে বন্ধুরূপে পাওয়া যায় এবং ধনবান ব্যক্তি সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে ও কেহই তখন তাহাকে হেয় বলিয়া ঘৃণা করে না। ধনের এবং বিদ আরও বহু উপকারিতা আছে।

ধনের অপকারিতা

ধন হইতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বহু আপদ দেখা দেয়। পারলৌকিক আপদসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। **প্রথম-** ধন মানুষকে দুষ্কর্ম ও পাপাচারে ক্ষমতাবান করিয়া তোলে এবং তাহার মন তখন পাপের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে দরিদ্রতা মানুষকে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক রাখিবার প্রধান সহায়। ধন লাভে পাপাচারে সক্ষম হইলে মানুষ ইহাতে লিপ্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধৈর্যধারণপূর্বক পাপ কার্য হইতে বিরত থাকা তখন তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। **দ্বিতীয়-** মনে কর, ধর্ম বিষয়ে কেহ নিতান্ত অটল ও সুদৃঢ় এবং পাপ কর্ম হইতে সে আত্মরক্ষাও করিতে পারে। কিন্তু বৈধ দ্রব্যাদি উপভোগ ও নির্দোষ ভোগবিলাস হইতে ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি কিরূপে নিজেকে রক্ষা করিবে? এমন কে আছে যে, সসাগরা বিশ্বের রাজত্ব লাভ করিয়াও হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের ন্যায় যবের রুটি ভক্ষণ ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া জীবন অতিবাহিত করে? মানুষ ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হইলেই দেহ উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং উহা ব্যতীত সে আর চলিতে পারে না। পার্থিক ভোগ-বিলাসের সম্বলস্বরূপ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলে দুনিয়া তাহার নিকট তখন পরম রমণীয় বেহেশ্‌তের ন্যায় বোধ হয় এবং মৃত্যুকে সে ঘৃণা করে। ভোগ-বিলাসের উপকরণাদি বৈধ উপায়ে অর্জন করাও সর্বদা সম্ভপর নহে। এমতাবস্থায়, সে সন্দেহযুক্ত ধন লাভে বাধ্য হয় এবং ধনার্জনের নিমিত্ত তাহাকে সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে মানুষ খোশামুদপ্রিয় হইয়া উঠে এবং মিথ্যা ও কপটতায় জড়িত হইয়া পড়ে। সরকারী কর্মচারীদের অনুগ্রহ ও নৈকট্য লাভ হইলে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সর্বদা ভীত সচেষ্ট থাকিতে হয়। তখন আবার আর এক বিপদ আসিয়া দেখা দেয়। রাজ কর্মচারীদের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিকে অপর লোকে ঈর্ষা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা সেই ব্যক্তির শত্রু হইয়া পড়ে এবং তাহাকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকে। সেও তখন প্রতিশোধ গ্রহণে প্রস্তুত হয় এবং তাহাদের প্রতি তাহার হিংসা ও শত্রুতার উদ্রেক হয়। এখন ভাবিয়া দেখ, নির্দোষ ভোগ-বিলাসের অভ্যাস কিরূপে পাপ টানিয়া

আনে। কারণ, ইহা হইতেই মিথ্যা, গীবত (অগোচরে পরনিন্দা), পরের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি অন্তর ও রসনাপ্রসূত সমস্ত পাপাচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাই সংসারাসক্তি, সকল পাপের মূল। অর্থাৎ পাপের শাখা-প্রশাখা এই মূল শিকড় হইতেই অঙ্কুরিত হয়; বরং এই আপদ একটি, দুইটি বা শতটি নহে, বরং এই আপদ অসংখ্য ও অগণিত। বাস্তবপক্ষে এই পাপসমুদ্র দোযখের ন্যায় অতল ও অসীম। **তৃতীয়**- ধনরক্ষার্থে মনোযোগহেতু আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ধ্যানে ব্যাঘাত। ধনের এই প্রকার অপকারিতা হইতে কেহই অব্যাহতি পায় না; তবে আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন, তেমন ব্যক্তিই এই আপদ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি সকল পাপকর্ম, এমন কি নির্দোষ ভোগবিলাস হইতেও বিরত থাকিতে পারে, সন্দেহজনক বিষয় হইতে দূরে সরিয়া থাকে, হালাল মাল অর্জন করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায়ই ইহা ব্যয় করে, তেমন নিষ্কলঙ্ক পরহেযগার ব্যক্তিকেও ধনরক্ষার্থ মনোযোগ দিতে হয় এবং ইহা তাহাকে আল্লাহ্‌র যিকির ও ধ্যান হইতে নিরস্ত রাখে। অথচ আল্লাহ্‌র যিকিরে তন্ময় হইয়া যাওয়া ও তাঁহার প্রেমে বিভোর থাকাই সকল ইবাদতের সার; এইরূপ উন্নত অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত দুনিয়া হইতে বেপরোয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার মন পার্থিব সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত, কেবল তেমন ব্যক্তিই এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারে।

আবার কোন ধনবান ব্যক্তির ভূসম্পত্তি বা জমিদারী থাকিলে তাহাকে ইহার বাসিন্দাদের অভিযোগাদি শ্রবণ, রাজস্ব প্রদান এবং প্রজাদের নিকট হইতে হিসাবাদি গ্রহণের চিন্তায় লাগিয়া থাকিতে হয়। ধনী ব্যক্তি ব্যবসায়ী হইলে অংশীদের অভিযোগ শ্রবণ, তাহাদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ, বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ পর্যটন এবং লাভজনক ব্যবসায়ের অনুসন্ধানের তাহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কেহ গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু পালন করিলে তাহার অবস্থাও তদ্রূপই হইয়া থাকে। ধন মাটির নীচে প্রোথিত রাখিয়া আবশ্যক মত কিছু কিছু ব্যয় করাতে ঝঞ্ঝাট সবচেয়ে কম। তথাপি সর্বদা ইহার রক্ষণাবেক্ষণে রত থাকিতে হয়। পাছে কেহ গ্রাস করিয়া ফেলে বা লোভের বশবর্তী হইয়া এই গুপ্ত ধন সম্পর্কে কেহ অবগত হয়, এই আশঙ্কা সর্বদাই লাগিয়া থাকে। মোটের উপর সংসারাসক্ত লোকের চিন্তা-ভাবনার কোন পরিসীমা নাই। দুনিয়াদার হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত থাকার বাসনা করা, আর পানিতে প্রবেশ করিয়া ভিজিবে না বলিয়া মনে করা, একই কথা।

অপরিমিত ধন বিষতুল্য—ধনের অপকারিতা ও উপকারিতা উপরে বর্ণিত হইল। ইহা হইতে বুদ্ধিমানগণ বুঝিতে পারিয়াছে যে, নিতান্ত অভাব মোচন হইতে পারে এই পরিমিত ধন উপকারী এবং ইহার অতিরিক্ত বিষতুল্য। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য আবশ্যক পরিমাণ উপজীবিকাই প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি সংক্ষেপে বলিয়াছেন- "যে ব্যক্তি অভাব

মোচনের পরিমাণের অধিক ধন গ্রহণ করে, সে নিজের বিনাশ ও ধ্বংসের উপকরণ সংগ্রহ করে।" তবে অভাব মোচনের উপযোগী ধন না রাখিয়া সমস্তই বিতরণ করিয়া দেওয়া শরীয়তে মকরূহ অর্থাৎ ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; যেমন আল্লাহ্ বলেন- وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا "আর হাত একেবারে খুলিয়া দিও না (অর্থাৎ অমিতব্যয়ী হইও না), তাহা হইলে তিরস্কৃত ও রিক্ত হস্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ৩ রুকু, ১৫ পারা)।

লোভের আপদ ও অল্পে তুষ্টির কল্যাণ

লোভের আপদ—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, লোভেও মন্দ স্বভাবের অন্তর্গত। লোভের বশীভূত হইলে মানুষকে ইহলোকে অপমানিত ও পরলোকে লজ্জিত হইতে হয়। আবার লোভ চরিতার্থ না হইলে ইহা হইতে বহুবিধ জঘন্য স্বভাব উদ্ভব হইয়া থাকে। কারণ, কেহ অপরের নিকট কোন কিছুর প্রত্যাশী হইলে সে তাহার খোশামুদে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে সে মুনাফিক হইয়া পড়ে; তদুপরি অপরের মন আকর্ষণের জন্য সে নিজের সাধুতা প্রদর্শন ও লোক দেখানো ইবাদত করিতে থাকে। যাহারা নিকট কিছু প্রত্যাশা করা হয়, সে প্রত্যাশাকারীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলে ও তাহার প্রতি অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলে সে এই অপমান অম্লানবদনে সহ্য করে। জন্মগতভাবেই মানুষ লোভী, সে স্বীয় সম্পদে পরিতুষ্ট হয় না। অতএব অল্পে তুষ্ট না হইলে সে কখনও লোভ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "স্বর্ণে পরিপূর্ণ দুইটি মাঠ পাইলেও মানুষ অপর একটির প্রত্যাশা করিবে। মৃত্তিকা ব্যতীত আর কোন দ্রব্যই মানব হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তাহার তওবা কবুল করিয়া থাকেন।" তিনি আরও বলেন- "মানুষের সব কিছুই বৃদ্ধি (হ্রাসপ্রাপ্ত) হইতে থাকে, কিন্তু দুইটি বিষয় যৌবন লাভ করিতে (বৃদ্ধি পাইতে) থাকে; প্রথম দীর্ঘকাল বাঁচিবার আকাঙ্খা ও দ্বিতীয় ধনাসক্তি।"

অল্পে তুষ্টির ফযীলত—রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আল্লাহ্ যাহাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও অভাব মোচনের উপযোগী ধন দিয়াছেন এবং সে উহাতে পরিতুষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি পুণ্যবান ও সৌভাগ্যশালী।" তিনি বলেন- "জিবরাঈল আমার অন্তরে ঢালিয়া দিলেন, 'জীবিকা নিঃশেষ না হইলে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।' (অতএব) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শান্তির সহিত ধীরে ধীরে জীবিকা অন্বেষণ কর।" অর্থাৎ ইহাতে বাড়াবাড়ি করিও না এবং লোভের বশবর্তী হইয়া সীমা অতিক্রম করিও না। তিনি বলেন- "সন্দেহযুক্ত ধন পরিত্যাগ করিলে আবিদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে; আল্লাহ্‌র দানে সন্তুষ্ট থাকিলে

তুমি কৃতজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিগণিত হইবে এবং নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর অপরের জন্য তাহাই পছন্দ করিলে তুমি (পূর্ণ) মু'মিন হইতে পারিবে।"

হযরত আওফ ইব্নে মালিক আশজায়ী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "আমরা আট নয় জন লোক রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, (এমন সময়) তিনি বলিলেন– 'তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের নিকট বায়'আত কর (অর্থাৎ আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ কর।)' আমরা নিবেদন করিলাম- 'আমরা কি একবার শপথ করি নাই?' তিনি আবার বলিলেন- 'তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের নিকট শপথ কর।' আমরা হস্ত প্রসারণ করত নিবেদন করিলাম- 'কোন্ কথার উপর শপথ করিব?' তিনি বলিলেন- আল্লাহ্র ইবাদত কর, পাঁব ওয়াক্ত নামায পড় এবং আল্লাহ্ যে আদেশ দেন ইহা শ্রবণ কর ও তদনুসারে কাজ কর। আর তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন- 'কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু চাহিও না।" এই উপদেশ শ্রবণের পর তাঁহাদের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহারা কাহারও নিকট হইতে কিছু চাহিতেন না, এমন কি কাহারও হস্ত হইতে চাবুক পড়িয়া গেলেও ইহা তুলিয়া দিবার জন্য তাঁহারা কাহাকেও বলিতেন না।

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করিলেন- "হে বিশ্বপ্রভু, তোমার বান্দাগণের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা ধনবান?" আল্লাহ্ বলিলেন- "আমি যাহা দান করি ইহাতেই যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে সে-ই ধনবান।' তিনি আবার নিবেদন করিলেন- "ন্যায়বিচারক কে?" আল্লাহ্ বলিলেন- " যে ব্যক্তি নিজ সম্বন্ধে সুবিচার করে।" হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (রা) শুষ্ক রুটি পানিতে ভিজাইয়া আহার করিতেন এবং বলিতেন- " যে ব্যক্তি ইহাতে পরিতৃপ্ত থাকে সে পরমুখাপেক্ষী হয় না।" হযরত ইবনে মাসউদ রাযীয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "প্রত্যহ এক ফেরেশতা ঘোষণা করে- ' হে আদম সন্তান, অধিক অমনোযোগিতাজনক, আনন্দদায়ক প্রচুর ধন অপেক্ষা তোমার অভাব মোচনের উপযোগী অল্প ধন উৎকৃষ্ট।" হযরত সমীত ইবনে উজলান (রা) বলেন- "তোমার উদর অর্ধ হাতের অধিক নহে; আচ্ছা, কেন তোমাকে ইহা দোযখে লইয়া যায়?"

হাদীসে কুদসীতে উক্ত হইয়াছে- "আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আদম সন্তান, আমি তোমাকে সমস্ত জগত দান করিলেও তুমি এই পরিমাণই ভক্ষণ করিতে পারিবে যদ্দ্বারা তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। এমতাবস্থায় আমি যদি তোমাকে ক্ষুধা নিবৃত্তি করার উপযোগী সম্পদ দান করি এবং অতিরিক্ত সম্পদের হিসাবের ঝামেলা অপরের উপর অর্পণ করি, তবে ইহার অধিক তোমার আর কি উপকার করিব?" কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন- 'লিপ্সু ও লোভী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক মানসিক যাতনা আর কেহই সহ্য করে না; অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক শান্তি কেহই লাভ করে না।" ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি

অপেক্ষা অধিক মনঃকষ্ট আর কেহই পায় না, সংসারবিরাগী অপেক্ষা অধিক ভারশূন্য আর কেহই নহে এবং যে আলিম ইল্ম অনুযায়ী কাজ করে না তাহার অপেক্ষা অধিক লজ্জিত আর কেহই হইবে না। হযরত সাম্মাক (রা) বলেন- " লোভ তোমার গলার ফাঁস ও পায়ের শৃঙ্খলস্বরূপ। গলার ফাঁস কাটিয়া ফেল, তাহা হইলে পায়ের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইবে।"

লোভ-লালসা দমনের উপায়—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ সহিষ্ণুতার তিক্ততা, ইল্মের মিষ্টতা ও আমলের কষ্টের মিশ্রণে যে মিক্চার প্রস্তুত হয় ইহাই লোভ-লালসার মহৌষধ। বস্তুত সকল আন্তরিক রোগের ঔষধ এই সমস্ত উপকরণ ও উপাদানেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাঁচ প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা লোভ-লালসা রোগের চিকিৎসা করিতে হয়।

প্রথম ব্যবস্থা—আমল বা অনুষ্ঠান। এই আমলের অর্থ হইল ব্যয় সঙ্কোচ করা এবং মোটা বস্ত্র ও ব্যঞ্জনহীন অন্নে পরিতুষ্ট থাকা। কোন কোন সময় ডাল, তারকারিও আহার করা যাইতে পারে; কেননা এইরূপ অন্ন ও মোটা বস্ত্র অনায়াসেই লাভ হইতে পারে। কিন্তু জাঁক-জমকের সহিত ব্যয় বৃদ্ধি করিলে অল্পে তুষ্টি সম্ভবপর হয় না। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "মিতব্যয়ী ব্যক্তি কখনও পরমুখাপেক্ষী হয় না।" তিনি বলেন- "তিনটি বিষয়ে মানবের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রথম- প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্কে ভয় করা; দ্বিতীয়- ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় পরিমিত ব্যয় করা; তৃতীয়- আনন্দের সময় ন্যায়বিচার পরিহার না করা।" এক ব্যক্তি দেখিল, হযরত আবূ দারদা রাযিয়াল্লাহু আন্হু খোরমার বীচি আহরণ করিতেছেন। তখন তিনি বলিতেছিলেন- "সহজ ও সরলভাবে জীবনযাপনের প্রতি লক্ষ্য রাখা বুদ্ধি ও ইল্মের পরিচায়ক।" তিনি অন্যত্র বলেন- " যে ব্যক্তি পরিমিত ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাহাকে পরমুখাপেক্ষা করেন না এবং যে ব্যক্তি অতিরিক্ত খরচ করে, সে অভাবগ্রস্ত থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে স্মরণ রাখে তিনি তাহাকে ভালবাসেন।" তিনি আরও বলেন- "ভূত-ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া ধীরস্থিরভাবে ব্যয় করা উপজীবিকার অর্ধাংশ।"

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—ভবিষ্যত উপজীবিকার চিন্তা না করা। এক দিনের উপজীবিকা পাইলে পর দিবসের আর চিন্তা করিও না। কেননা, শয়তান তোমাকে প্ররোচণা দিয়া বলিবে- "সম্ভবত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে এবং হয়ত আগামীকল্য কিছুই মিলিবে না। অদ্যই প্রাণপণ চেষ্টায় জীবিকার অর্জনে ব্যাপৃত হও এবং যে স্থান হইতেই হউক না কেন ভবিষ্যতের জন্য অর্জন করিয়া রাখ।" এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আল্লাহ্ বলেন- اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ "শয়তান তোমাদিগকে দরিদ্রতার ভয় প্রদর্শন করে এবং কুকর্মের আদেশ করে" (সূরা বাকারা, ৩৭ রুকূ, ৩ পারা)। শয়তান মানুষকে আগামীকল্যের অভাবের চিন্তায় ব্যাকুল করিয়া এবং

তাহাকে ফকীরের বেশ ধারণ করাইয়া উপহাস করিতে চায়। অথচ মানবজীবন এত অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী যে, হয়ত আগামীকল্যের মুখ দেখা তাহার ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে। আর অদ্য তুমি লোভের বশীভূত হইয়া যেরূপ মনঃকষ্টে জর্জরিত হইতেছ আগামীকল্য জীবিত থাকিলেও তোমাকে এত অধিক যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। মানুষ যদি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া লয় যে, লোভ-লালসার দরুন জীবিকা মিলে না, বরং আল্লাহ্‌র বিধানে ইহা নির্ধারিত আছে এবং স্বতঃই ইহা আসিয়া জুটিবে, তবে সে লোভের আপদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে বিষণ্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন- "অধিক কষ্ট করিও না। আল্লাহ্ যাহা অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই ঘটিবে এবং সর্বাবস্থায় তোমার রিযিক তুমি পাইবে।" অনেক সময় দেখা যায় যে, মানুষের রিযিক এমন স্থান হইতে জুটে যে স্থানের কল্পনাও সে করে নাই। আল্লাহ্ বলেন-

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তাহার জন্য মুক্তির পথ করিয়া দিবেন এবং তিনি তাহাকে এমন স্থান হইতে জীবিকা দান করিবেন যে, সে কল্পনাও করিত না" (সূরা তালাক, ১ রুকু, ২৮ পারা)। হযরত আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "পরহেযগার হও; পরহেযগার ব্যক্তি কখনও অনাহারে প্রাণত্যাগ করে না।" অর্থাৎ আল্লাহ্ লোককে পরহেযগারের প্রতি এইরূপ উদার করিয়া তুলেন যে, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরহেযগারের নিকট প্রচুর ধন লইয়া যায়। হযরত আবূ হাযিম রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "সমুদয় বস্তু দুইভাগে বিভক্ত। আমার (অদৃষ্টে নির্ধারিত) জীবিকা সর্বাবস্থায় আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিবে। আর বিশ্ববাসীর মিলিত চেষ্টায়ও অপরের জীবিকা আমার নিকট পৌঁছিবে না। এমতাবস্থায়, জীবিকা অন্বেষণে ব্যাকুল হওয়া অনাবশ্যক ও নিষ্ফল।"

তৃতীয় ব্যবস্থা—অপরের নিকট যাঞ্চা না করিয়া ধৈর্যধারণ করিয়া থাকা। মানুষ লোভের বশীভূত না হইয়া ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে অভাবের তাড়নায় সে দুঃখ পাইবে সত্য, কিন্তু ধৈর্যহীন হইয়া লোভী হইলে তাহাকে অপমানিত ও দুঃখিত উভয়ই হইতে হইবে। কারণ, লোভের দরুন লোকে তাহাকে তিরস্কার করিবে এবং সে পরকালের শাস্তির আশঙ্কায় নিপতিত থাকিবে। অপরপক্ষে অভাবের সময় ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে পরকালে সে সওয়াবেরও ভাগী হইবে এবং ইহজগতে লোকেও তাহার প্রশংসা করিবে। অতএব অভাব-অনটনের ক্ষণিক তাড়নায় লোভের বশবর্তী হইয়া ইহজগতে লোকের ঘৃণা ও তিরস্কারের বোঝা বহন করত পরকালের শাস্তিতে নিপতিত হওয়া অপেক্ষা ইহকালে লোকের প্রশংসা ও সম্মানের পাত্র হইয়া পরকালে

সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "পরের মুখাপেক্ষী না হওয়াতেই মুসলমানদের সম্মান নিহিত আছে।" হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু বলেন- "তুমি যাহার মুখাপেক্ষী বস্তুত তুমি তাহার কয়েদী এবং যে তোমার মুখাপেক্ষী তুম তাহার প্রভু। অন্যথায় তোমরা উভয়েই সমান।"

চতুর্থ ব্যবস্থা—লোভের কারণ অনুসন্ধানপূর্বক ফেরেশতার গুণ অর্জনের চেষ্টা করা। মানুষের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, কি উদ্দেশ্যে তাহার হৃদয়ে লোভ জন্মে। উদর পূর্ণ করিবার জন্য যদি লোভ হইয়া থাকে তবে ভাবিয়া দেখ গরু, গর্দভ ইত্যাদি জন্তুও তো তাহা অপেক্ষা অধিক উদর পূর্ণ করিয়া আহার করে। কামবাসনা চরিতার্থের জন্য যদি লোব জন্মে তবে চিন্তা করিয়া দেখ, শুকর ও ভল্লুক তদপেক্ষা অধিক কামুক। আর যদি শান-শওকত ও নানা রঙ্গের বিচিত্র বসনভূষণের লোভ হইয়া থাকে তবে দেখ, অধিকাংশ য়াহুদী ও খৃষ্টান এই বিষয়ে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপরপক্ষে লোভ দমন করত অল্পে পরিতুষ্ট হইলে মানুষ আওলিয়া ও আম্বিয়াগণের গুণে গুনান্বিত হইয়া উঠে। অতএব নরাকৃতি হিংস্র পশু হওয়া অপেক্ষা ফেরেশতা-প্রকৃতির মানুষ হওয়া বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

পঞ্চম ব্যবস্থা—ধনের আপদ ও অনিষ্টকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা। সংসারে অধিক ধন হইলে বিপদের আশঙ্কা ও ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পরলোকে ধনী ব্যক্তি দীনহীন কাঙ্গাল অপেক্ষা পাঁচশত বৎসর পরে বেহেশ্‌তে গমন করিবে। সর্বদা নিজ অপেক্ষা নিঃস্ব দরিদ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; তাহা হইলে তোমার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল দেখিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিবে। কখনও তোমা অপেক্ষা ধনীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাকে যে সম্পদ দান করিয়াছেন, ইহা তোমার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা দরিদ্র তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর।" শয়তান সর্বদা প্ররোচণা দিতে থাকে- "অমুক অমুক লোক কত ধনবান! তুমি কেন অল্পে পরিতুষ্ট থাকিবে?" তুমি অবৈধ ও সন্দেহযুক্ত ধন বর্জন করিলে শয়তান বলে- "অমুক আলিম ত অবৈধ ও সন্দেহযুক্ত ধন বর্জন করে না; তুমিই-বা ইহা কেন বর্জন করিবে?" সাংসারিক বিষয়ে শয়তান সর্বদা এইরূপ প্ররোচণাই দিতে থাকে এবং ঐ প্রকার লোকদের দৃষ্টান্ত তোমার সম্মুখে উপস্থাপিত করে যাহারা পার্থিব বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অগ্রণী ও পারলৌকিক বিষয়ে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পারলৌকিক বিষয়ে সর্বদা বুযুর্গদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে; তাহা হইলে তুমি নিজকে চিনিতে পারিবে এবং বুঝিতে পারিবে যে, তুমি তাঁহাদের অপেক্ষা কত নীচ। আর পার্থিব বিষয়াদিতে নিঃস্ব দরিদ্রগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে যেন তুমি নিজকে ধনী বলিয়া মনে করিতে পার।

দানশীলতার ফযীলত ও সওয়াব

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, দরিদ্রের কর্তব্য লোভের বশীভূত না হইয়া অল্পে তুষ্টির পথ অবলম্বন করা; আর ধনীর উচিত কৃপণতা বর্জন করত দানশীলতার পথ অবলম্বন করা।

হাদীসে দানশীলতার ফযীলত—রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "সাখাওয়াত (দানশীলতা) বেহেশতের একটি বৃক্ষস্বরূপ। ইহার শাখাসমূহ দুনিয়াতে ঝুলিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি দানশীল সে ইহার একটি শাখা ধরিয়া লয় এবং এই শাখা তাহাকে বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। আর বুখল (কৃপণতা) দোযখের একটি বৃক্ষস্বরূপ। যে ব্যক্তি ইহার কোন শাখা ধরিয়া লয়, সে দোযখে যাইয়া উপস্থিত হয়।" তিনি বলেন- "দুইটি গুণ আল্লাহ্ অত্যন্ত ভালবাসেন- একটি দানশীলতা ও অপরটি সৎস্বভাব।" তিনি বলেন- "দুইটি প্রকৃতি আল্লাহ্ ঘৃণা করেন- একটি কৃপণতা অপরটি অসৎস্বভাব।" তিনি বলেন- "দানশীল ও সৎস্বভাবী হয় না, এমন কোন ওলী আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন নাই।" তিনি আরও বলেন- "দানশীল ব্যক্তির ত্রুটি মার্জনীয়; কারণ সে দুঃখকষ্টে নিপতিত হইলে আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।"

এক জিহাদে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কতকগুলি লোককে বন্দী করিলেন এবং একজন ব্যতীত সকলকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি সকলকে হত্যা করিলেন; কিন্তু একই ধর্ম, একই অপরাধ ও একই খোদা হাওয়া সত্ত্বেও এই ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন না কেন?" উত্তর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "জিবরাঈল আলায়হিস সালাম আসিয়া জানাইলেন যে, এই ব্যক্তি দানশীল এবং তজ্জন্য তাহাকে হত্যা করিতে নিষেধ করিলেন।" তিনি আরও বলেন- "দানশীল ব্যক্তির অন্ন (রোগের) ঔষধ এবং কৃপণের অন্ন হুবহু রোগ।" তিনি বলেন- "দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্, বেহেশত ও লোকদের নিকটবর্তী এবং দোযখ হইতে দূরবর্তী। আর কৃপণ আল্লাহ্ হইতে দূরে, বেহেশত হইতে দূরে, লোকদের হইতে দূরে; কিন্তু দোযখের নিকটবর্তী। আল্লাহ্ দানশীল মূর্খ ব্যক্তিকে কৃপণ আবিদ অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। (আন্তরিক) রোগসমূহের মধ্যে কৃপণতা জঘণ্যতম রোগ।" তিনি অন্যত্র বলেন- "আমার উম্মতের আবদালগণ নামায রোযার কল্যাণে বেহেশতে যাইবে না, বরং দানশীলতা, হৃদয়ের পবিত্রতা, সদুপদেশ ও সৃষ্টির প্রতি তাহাদের মমতার জন্য বেহেশতে প্রবেশ করিবে।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ হযরত মূসা আলায়হিস সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ করিলেন- "সামিরীকে হত্যা করিও না; কারণ সে দানশীল।" (সামিরী স্বর্ণ নির্মিত গোবৎসকে প্রভু বলিয়া ঘোষণা করে এবং ইহাকে সিজদা করিতে নির্দেশ দেয়। অসংখ্য বনী ইসরাঈল তাহার প্ররোচণায় উক্ত গোবৎসকে সিজদা করিয়া ঈমান হারায়)।

বুযুর্গগণের উক্তিতে দানশীলতার ফযীলত—হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "দুনিয়া তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলে তোমার নিকট সম্পদ আসিতেই থাকিবে; কাজেই নিশ্চিন্ত মনে সৎ কাজে ব্যয় কর। আর দুনিয়া তোমার প্রতি বিমুখ হইলে সম্পদ ত থাকিবেই না; কাজেই আল্লাহ্‌র পথে মুক্ত হস্তে খরচ কর।"

দানশীলতার উদাহরণ—এক ব্যক্তি হযরত ঈমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে স্বীয় আর্থিক দুরবস্থা লিখিয়া জানাইল। তিনি কাগজটি হাতে লইয়াই বলিলেন- "তোমার অভাব মোচন হইয়াছে।"(অর্থাৎ তিনি তাহাকে অভাব মোচনের পরিমিত অর্থ দানের আদেশ দিলেন)। লোকে জিজ্ঞাসা করিল- "আপনি কাগজটি পাঠ করিলেন না কেন? তিনি বলিলেন- "আমি ভয় করিতেছিলাম যে, যদি অপরের নিকট প্রার্থনাজনিত অপমানের সহিত তাহাকে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখি, তবে আমাকে আল্লাহ্‌র নিকট জওয়াবদিহি করিতে হইবে।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার পরিচারিকা হযরত উম্মে যাবরাহ (রা) হইতে হযরত মুহম্মদ ইব্‌নে মুন্‌কাদির রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আন্হু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার নিকট দুই থলি রৌপ্যমুদ্রা ও এক লক্ষ আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেন। তিনি তৎক্ষণাত উহা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তৎপর সন্ধ্যাকালে তাঁহার উক্ত পরিচারিকাকে ইফতারের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিবার আদেশ দিলে পরিচারিকা গৃহে গুশত ছিল না বলিয়া রুটি ও জয়তুন তৈল উপস্থিত করত নিবেদন করিলেন- "বিবি সাহেবা, আপনি সব ধন বিতরণ করিয়া দিলেন; আপনার পরিচারিকাগণের জন্য সামান্য গুশ্‌ত খরিদের উদ্দেশ্যে একটি দেরেম দিলে কোন ক্ষতি ছিল কি?" তিনি বলিলেন- "হাঁ, তখন স্মরণ করাইয়া দিলে আনাইয়া দিতাম।"

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আন্হু এক সময় মদীনা শরীফে আগমন করিলে হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্হু হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে নিষেধ করিলেন। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) প্রস্থানকালে হযরত হাসান (রা) পশ্চাদানুসরণ করিয়া তাহাকে জানাইলেন যে, তিনি ঋণগ্রস্ত। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) একটি উট পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, সেই উষ্ট্রপৃষ্ঠে আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা আছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) তৎক্ষণাত ঋণ পরিশোধের জন্য সমস্ত ধনসহ উটটি হযরত ইমাম হাসানকে (রা) দান করিলেন। হযরত আবূল হাসান মাদায়েনী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- একবার হযরত ইমাম হাসান, হযরত ইমাম হুসাইন ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জা'ফর

রাযিয়াল্লাহু আন্হুম হজ্জে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের খাদ্যবাহী উট পশ্চাতে রহিয়া গেল। একস্থানে ক্ষুৎপিপাসা খুব প্রবল হইয়া উঠিলে তাঁহারা এক বৃদ্ধার সমীপে উপস্থিত হইয়া কিছু পানীয় দ্রব্য চাহিলেন। বৃদ্ধার একটিমাত্র ছাগ ছিল। সে ইহা দোহন করিয়া তাহাদিগকে দুগ্ধপান করিতে দিল। তাঁহারা সকলেই পান করিলেন। তৎপর তাঁহারা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "আহারের কিছু আছে কি?" বৃদ্ধা বলিল- "হাঁ, এই ছাগটিই যবেহ্ করিয়া ইহার গুশ্ত আহার করুন।" তাঁহারা ছাগটি যবেহ্ করিয়া ইহার গুশ্ত আহার করিলেন এবং বলিলেন- "আমরা কুরায়শ বংশীয় লোক। আমরা এই সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে আমাদের নিকট আসিও। আমরা ইহার প্রতিদান দিব।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলে বৃদ্ধার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল- "যাহাদিগকে চিনও না এমন অপরিচিত লোকদিগকে আমার একমাত্র সম্বল ছাগটি পর্যন্ত খাওয়াইয়া দিলে?" ঘটনাচক্রে এই বৃদ্ধা ও তাহার স্বামী যথাসর্বস্ব হারাইয়া দেউলিয়া হইয়া পড়িল এবং মজুরী করিবার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে চলিয়া গেল। হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আন্হু বৃদ্ধাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাহাকে এক হাজার ছাগল ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। এইরূপে হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্হুও বৃদ্ধাকে এক হাজার ছাগল এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করত স্বীয় পরিচারকের সহিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আন্হুমার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও দুই হাজার ছাগল দান করিয়া বলিলেন- "তুমি প্রথমে আমার নিকট আসিলে এত অধিক পরিমাণে দান করিতাম যে, উক্ত দুই মহাত্মা তোমাকে এত দান করিতে পারিতেন না।" অতঃপর বৃদ্ধা চারি হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও চারি হাজার ছাগল লইয়া স্বীয় স্বামীর নিকট চলিয়া গেল।

হযরত আবূ সাঈদ খরগোশী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- 'মিশরে মুহ্তাসিব নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। সে দরিদ্রগণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া দিত। এক নিঃসম্বল দরিদ্রের গৃহে একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে সে মুহ্তাসিবের নিকট আগমন করিল। মুহ্তাসিব তাহাকে সঙ্গে লইয়া বহু লোকের নিকট তাহার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিল; কিন্তু কেহই কিছু দিল না। অবশেষে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া এক কবরের পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং তথায় উপবেশন করত ঐ কবরবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল- "ওহে পরলোকগত ব্যক্তি, আপনার উপর আল্লাহ্র দয়া বর্ষণ করুন। আপনি দীন-দরিদ্রদের দুঃখ দূর করিতেন এবং তাহাদের অভাব মোচন করিতেন। আমি আজ এই ব্যক্তির সদ্যপ্রসূত সন্তানের জন্য বহু লোকের নিকট সাহায্য চাহিলাম; কিন্তু কেহই কিছু দিল না।" ইহা বলিয়া মুহ্তাসিব উঠিয়া বসিল। তাহার নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে ইহা দ্বিখণ্ড করত এক খণ্ড এই দরিদ্রকে দিয়া বলিল- "ঋণস্বরূপ ইহা তোমাকে দিতেছি, অর্থ হইলে

পরিশোধ করিও।" ঐ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ইহা তাহার শিশু সন্তানের জন্য ব্যয় করিল। মুহ্তাসিব ঐ মৃত ব্যক্তিকে মধ্যরাত্রিতে স্বপ্নে দেখিল; তিনি বলিতেছিলেন- "তোমরাই এই ধনের অধিকারী; উহা গ্রহণ কর।" তাহারা বলিল, "সুবহানাল্লাহ্, মৃত ব্যক্তি তো দান করিলেন, আর আমরা জীবিত থাকিয়া কৃপণতা করিব?"

মুহ্তাসিব পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ঐ দরিদ্র ব্যক্তির নিকট গমন করিল। সে একটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া দ্বিখণ্ডিত করিল এবং একটি খণ্ড দ্বারা তাহার ঋণ পরিশোধপূর্বক মুহ্তাসিবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল- "অবশিষ্টগুলি লইয়া যাইয়া অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিন। আমার অর্ধ স্বর্ণমুদ্রারই আবশ্যক ছিল।" হযরত আবূ সাঈদ খরগোশী (রা) বলেন- "তাহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম দানশীল ও উত্তম, ইহা বুঝা দুষ্কর।" তিনি আরও বলেন- "আমি যখন মিশরে গেলাম তখন উক্ত মৃত ব্যক্তির বাড়ী অনুসন্ধান করিলাম। দেখিতে পাইলাম তাহার পুত্রগণের বদনমণ্ডলে সৌভাগ্যের নিদর্শনাবলী উদ্ভাসিত রহিয়াছে। তখন আমার এই আয়াতটি স্মরণ হইল وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا "তাহাদের উভয়ের পিতা সৎ ছিলেন।"

পরলোকগমনের পর দানশীলতার বরকত—প্রিয় পাঠক, পরলোকগমনের পরও দানশীলতার বরকত এবং ইহার নিদর্শনাবলী অবশিষ্ট থাকে শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিও না। অনুধাবন কর, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম স্বীয় গৃহে অতিথি রাখিতেন; ইহার ফলে অদ্যাবধি তাঁহার পবিত্র সমাধিস্থলে উহার বরকত অক্ষুণ্ন রহিয়াছে।

একদা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু রোদন করিতেছিলেন। লোকে নিবেদন করিল- "হে আমীরুল মুমিনীন, রোদন করিতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন- "এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে চলিল, আমার গৃহে কোন অতিথি আসে নাই (এইজন্য আমি রোদন করিতেছি)।" এক ব্যক্তি তাহার জনৈক বন্ধুকে বলিল- "আমি চারিশত দেরেমের ঋণগ্রস্ত।" ইহা শোনামাত্রই সে তাহাকে চারিশত দেরেম দান করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ইহাতে তাহার স্ত্রী বলিল- "দান করত রোদন করিতে হইলে দান করিলে কেন?" সেই ব্যক্তি বলিল, -"রে বোকা, আমি তাহার অবস্থা সম্বন্ধে খবর লই নাই বলিয়া আমার নিকট তাহাকে চাহিতে হইতেছে, এইজন্য আমি রোদন করিতেছি।"

কৃপণতার জঘন্যতা—আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ যাহাকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে মুক্তি পাইয়াছে" (সূরা- হাশর, ১ রুকু, ২৮ পারা)।

আল্লাহ্ আরও বলেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الاية

অর্থাৎ "কখনই এইরূপ কল্পনাও করিও না যে, যাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদে কৃপণতা করে তাহারা ভাল করে। বরং ইহা তাহাদের জন্য নিতান্ত মন্দ। যে বস্তুতে তাহারা কৃপণতা করে শীঘ্রই সেই বস্তুর জিঞ্জির প্রস্তুত করত তাহাদের গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কৃপণতা হইতে দূরে থাক; কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী কওম কৃপণতার দরুণই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কৃপণতা তাহাদিগকে নরহত্যা কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল, অনন্তর তাহারা নরহত্যা করিল ও হারামকে হালাল মনে করিয়া লইল।" তিনি বলেন- "তিনটি বিষয় বিনাশকারী; প্রথম- কৃপণতা, যখন ইহার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া অনুসরণ করা হয়; দ্বিতীয়-অলীক কামনা যদি ইহার পশ্চাদনুসরণ করা হয়; তৃতীয়- নিজকে নিজে ভাল মনে করা।" হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া একটি উটের মূল্য চাহিল; তিনি দিয়া দিলেন। তাহারা বাহিরে যাইয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর সম্মুখে শুকরিয়া আদায় করিল! হযরত ওমর (রা) ইহা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জানাইলেন। হযরত (সা) বলিলেন- 'অমুক ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা অধিক লইয়া গেল, অথচ শুকরিয়া আদায় করিল না' অতঃপর তিনি আরও বলিলেন- 'তোমাদের মধ্যে কেহ আসিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া আমার নিকট হইতে যারা কিছু গ্রহণ করে, ইহা অগ্নিস্বরূপ।' হযরত ওমর (রা) নিবেদন করিলেন- 'অগ্নি হইলে আপনি দেন কেন?' তিনি বলিলেন- 'কারণ সে কাকুতি-মিনতি করে এবং আল্লাহ্ ইহা পছন্দ করেন না যে, আমি কৃপণতা করি ও দানে বিরত থাকি।"

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কা'বা শরীফ তওয়াফ করিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি কা'বা শরীফের কড়া ধরিয়া বলিতেছিল- "হে দয়াময় আল্লাহ্, এই পবিত্র গৃহের বরকতে আমার গোনাহ্ মাফ কর।" তিনি ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- "তোমার গোনাহ্ কি প্রকার?" সেই ব্যক্তি বলিল- "আমার গোনাহ্ এত বড় যে আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।" তিনি বলিলেন- "তোমার গোনাহ্ বড়, না পৃথিবী বড়?" সেই ব্যক্তি বলিল- "আমার গোনাহ্ ইহা অপেক্ষা বহুগুণে বড়।" তিনি বলিলেন- "তোমার গোনাহ বড়, না আল্লাহ্ স্বয়ং বড়।" সেই ব্যক্তি বলিল- "স্বয়ং আল্লাহ্ ত সর্বাপেক্ষা বড়।" হযরত (সা) বলিলেন- "আচ্ছা, তোমার গোনাহ্ কিরূপ বর্ণনা কর।" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "আমি অতুল

ঐশ্বর্যের অধিকারী; কিন্তু দূর হইতে কোন অভাবগ্রস্তকে আসিতে দেখিলে আমার মনে হয় যেন আগুন আসিতেছে যাহাতে আমি জ্বলিয়া যাইব।" হযরত (সা) বলিলেন- "তুমি আমা হইতে দূরে থাক, যেন স্বীয় অগ্নিতে আমাকেও জ্বালাইয়া না ফেল। সেই আল্লাহ্‌র শপথ যিনি আমাকে সত্য পথে প্রেরণ করিয়াছেন, যদি তুমি সহস্র বৎসর রুক্‌ন্ ও মাকামের মধ্যবর্তী স্থানে (ইহা কা'বা শরীফে বিশেষ মরতবার স্থান) নামায পড়, এত রোদন কর যে তোমার অশ্রুতে নদী প্রবাহিত হইতে থাকে এবং বৃক্ষ জন্মে, আর তুমি কৃপণতার অপরাধে অপরাধী হইয়া পরলোকগমন কর, তবে তোমার স্থান দোযখ ব্যতীত আর কোথাও হইবে না। তোমার সতর্ক হওয়া আবশ্যক, কৃপণতা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত এবং কুফরীর পরিণাম অগ্নি। আফ্‌সোস, তুমি আল্লাহ্‌র বাণী শুন নাই? তিনি বলেন-

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ

'আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে যে, সে নিজের ক্ষতি সাধন করে।' (সূরা মুহাম্মদ, ৪ রুকূ; ২৬ পারা।) তিনি আরও বলেন-

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ যাহাকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে-ই মুক্তি পাইয়াছে।"

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "প্রত্যহ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য দুই জন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করা হয় এবং তাহারা বলেন- ' হে আল্লাহ্, যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহার ধন ধ্বংস করিয়া দাও; আর যে ব্যক্তি (সৎকাজে) ব্যয় করে তাহাকে ইহার বিনিময়ে আরও দান কর।" হযরত ইমাম আবূ হানিফা রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- "কৃপণকে আমি পরহেযগার বলিয়া গ্রহণ করিব না। কারণ, কৃপণতার দরুন সে স্বীয় প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক লাভ করিবার অন্বেষণে থাকে।" হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলায়হিস সালাম শয়তানকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- "কোন্ ব্যক্তি তোর বড় শত্রু? আর কোন্ ব্যক্তি তোর অধিক প্রিয়পাত্র?" শয়তান বলিল- "সংসার বিরাগী কৃপণকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। কারণ, সে অতি কঠোর পরিশ্রমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে; কিন্তু কৃপণতা তাহার সমস্ত ইবাদত ধ্বংস করিয়া ফেলে। আর পাপাচারী দানশীল ব্যক্তিকে আমি বড় শত্রু বলিয়া মনে করি। কারণ সে খুব আমোদ-প্রমোদ করে এবং শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, দানশীলতার কারণে আল্লাহ্ হয়তো কোন সময় ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এবং সে তওবা করিয়া সৎপথে ফিরিয়া আসিতে পারে।"

নিজে অভাব বরণ করত পরের অভাব মোচন

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, নিজে অভাব বরণ করত পরের অভাব মোচন করাকে ঈছার বলে; ইহা দানশীলতা হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য অপরকে প্রদান করাই দানশীলতা। যে দ্রব্যে নিজের আবশ্যকতা রহিয়াছে ইহা অপরকে দান করা যেমন দানশীলতার চরমোৎকর্ষ, তদ্রূপ স্বয়ং নিজের আবশ্যক কার্যেও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া, এমন কি নিজে পীড়িত হইলেও ঔষধ পথ্যাদিতে খরচ না করিয়া অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া অভাব মোচনের আশা করা, কৃপণতার পরাকাষ্ঠা।

ঈছারের বড় ফযীলত রহিয়াছে। এই জন্যই আল্লাহ্ আনসারগণের ঈছারের প্রশংসা করিয়া বলেন–

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"তাহারা নিজের উপর অপরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে যদিও তাহাদের অভাব হয়।" (সূরা হাশ্‌র, ১ রুকূ, ২৮ পারা।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি তাহার নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে দান করে, আল্লাহ্ তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।" হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন– "রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহে আমরা কেহই কোন সময় ক্রমাগত তিন দিনও তৃপ্তির সহিত ভোজন করি নাই। আর আমরা (তৃপ্তির সহিত) ভোজন করিতেও পারিতাম না; কারণ আমাদের আবশ্যকতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমরা সমস্ত বিতরণ করিয়া দিতাম।"

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এক অতিথি আসিল; কিন্তু সেই দিন তাঁহার গৃহে খাদ্যদ্রব্য কিছুই ছিল না। এমন সময় জনৈক আনসারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু আসিয়া উক্ত অতিথিকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। তাহার গৃহেও আহার্য দ্রব্য অতি অল্পই ছিল। তিনি অতিথির সম্মুখে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য উপস্থাপিত করত প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন এবং আহারের ভান করিয়া মিছামিছি হাতমুখ নাড়িতে লাগিলেন যেন অতিথি মনে করে যে, তিনিও তাহার সহিত আহারে প্রবৃত্ত আছেন। পর দিবস রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উক্ত আনসারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– "তুমি ঐ অতিথির প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার ও ঈছার করিয়াছ, আল্লাহ্ ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিয়াছেন এবং এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

হযরত মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলেন–" হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আমাকে প্রদর্শন কর।"

আল্লাহ্ বলিলেন– "হে মূসা, উহা দর্শন করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। তবে মুহাম্মদের (সা) উন্নত মর্যাদার মধ্য হইতে একটি তোমাকে দেখাইব।" তৎপর একটি সোপান দেখাইলে সেই মহত্ত্ব ও দীপ্তিতে হযরত মূসা আলায়হিস সালাম অভিভূত হইয়া পড়ার উপক্রম হইলেন। অনন্তর হযরত মূসা আলায়হিস সালাম নিবেদন করিলেন– "হে খোদা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মর্যাদার এত উন্নত সোপান কিরূপে লাভ করিলেন?" প্রত্যাদেশে হইল– "ঈছারের কারণে।" আল্লাহ্ আরও বলিলেন– "হে মূসা, যে ব্যক্তি সমস্ত জীবনে একবারও ঈছার করে; তাহার নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ করিতে আমি লজ্জাবোধ করি। তাহার বাসস্থান বেহেশ্‌ত। সে যথায় ইচ্ছা তথায় থাকিতে পারিবে।"

একবার ভ্রমণকালে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এক খোরমা বাগানে উপস্থিত হইলেন। এক কৃষ্ণকায় হাবশী গোলাম সেই বাগানে প্রহরীরূপে নিযুক্ত ছিল। তাহার জন্য তিনটি রুটি আনয়ন করা হইল; এমন সময় তথায় একটি কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। গোলাম একটি রুটি উঠাইয়া লইয়া কুকুরটির সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। কুকুরটি ইহা খাইয়া ফেলিল। গোলাম একে একে অপর দুইটি রুটিও কুকুরটির সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া দিল এবং ইহা এইগুলিও উদরস্থ করিয়া লইল। ইহা দেখিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "প্রত্যহ তুমি কি পরিমাণ আহার পাইয়া থাক?" সে বলিল– "অদ্যের ন্যায় তিনটি রুটি।" তিনি বলিলেন– "তুমি সবগুলি রুটি কুকুরকে দিলে কেন?" সে বলিল– "এই স্থানে কোন কুকুর নাই। আমি ভাবিলাম কোন দূরবর্তী স্থান হইতে ইহা আসিয়াছে। অতএব ক্ষুধিত অবস্থায় ইহা চলিয়া যাইবে, উহা আমার মনঃপুত হইল না।" তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– "আচ্ছা তুমি অদ্য কি আহার করিবে?" সে বলিল– "অদ্য অনাহারে ছবর করিয়া থাকিব।" তিনি বলিলেন– "সুবহানাল্লাহ্, লোকে ত আমাকে দানশীল বলিয়া মনে করে, কিন্তু দানশীলতা বিষয়ে এই হাবশী গোলাম ত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" অনন্তর হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) উক্ত গোলামটিকে খরিদ করত মুক্ত করিয়া দিলেন এবং খোরমার বাগানটিও ক্রয় করিয়া তাহাকে দান করিলেন।

কাফিরগণ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তাহারা রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে এই আভাস পাইয়া এক রজনীতে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিছানায় শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কাফিরগণ আক্রমণ করিতে আসিলে তিনিই হযরতের পরিবর্তে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন। এমন সময় আল্লাহ্ হযরত জিব্‌রাঈল (আ) ও হযরত মীকাঈল (আ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– "আমি তোমাদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছি এবং একজনকে অপরজন অপেক্ষা দীর্ঘায়ু করিয়াছি। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে অপরের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে?"

কিন্তু তাহারা উভয়েই দীর্ঘ পরমায়ু প্রার্থনা করিল। অনন্তর আল্লাহ্ বলিলেন– "তোমরা আলীর ন্যায় কার্য করিতে পারিলে না কেন? আমি মুহাম্মদের (সা) সহিত তাহার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছি। সে স্বীয় জীবন আমার প্রিয় বন্ধু ও রাসূলের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে এবং স্বীয় ভ্রাতার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এখন তোমরা উভয়ে যাইয়া তাহাকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা কর।" তাঁহারা তৎক্ষণাত হযরত আলীর (রা) নিকট আগমন করিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার শিয়রে ও হযরত মীকাঈল (আ) তাঁহার পদপ্রান্তে দন্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন– "সাবাস! হে আবূ তালেব তনয়, আনন্দিত হউন। আপনার বিষয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদের সম্মুখে গর্ব করিতেছেন। আর তিনি এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ الاية

'লোকের মধ্যে এমন লোক আছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বীয় জীবন দান করে।" (সূরা বকর, ২৫ রুকূ, ২ পারা।)

হযরত হাসান ইস্তাকী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি শ্রেষ্ঠ বুযুর্গগণের অন্যতম ছিলেন। একদা তাঁহার বন্ধুবর্গ হইতে ত্রিশের অধিক লোক তাঁহার গৃহে সমবেত হইলেন। সকলের আহারের উপযোগী রুটি তখন তাঁহার গৃহে ছিল না। সুতরাং রুটিসমূহ টুকরা টুকরা করিয়া সকলের সম্মুখে পরিবেশনপূর্বক গৃহের প্রদীপ সরাইয়া নেওয়া হইল। সকলেই আহারের নিমিত্ত উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পর প্রদীপটি আনয়ন করা হইলে দেখা গেল রুটির টুকরাসমূহ সকলের সম্মুখেই পূর্ববৎ রহিয়াছে। নিজে ভক্ষণ না করিয়া অপরকে দিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেহই ভক্ষণ করেন নাই। হযরত হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন– "তাবুকের যুদ্ধে বহু মুসলমান শহীদ হন। তন্মধ্যে আমার চাচাত ভাইও ছিলেন। পানি লইয়া আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তাঁহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম– 'হে ভ্রাত, পানি পান করিবেন কি?' তিনি বলিলেন– 'হাঁ, পান করিব।' এমন সময় তাঁহার পার্শ্ববর্তী অপর এক আহত ব্যক্তি 'আহা' করিয়া উঠিলেন। (ইহা শুনিয়া) আমার ভ্রাতা তাঁহার নিকট পানি লইয়া যাইতে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন। আমি যাইয়া দেখিলাম তিনি হযরত হেশাম ইব্ন আস (রা)। তিনিও তখন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁহাকে পানি পান করিতে বলিলাম। এমন সময় অপর এক ব্যক্তি 'আহা' বলিয়া চীৎকার করিল। হযরত হেশাম (রা) বলিলেন– 'প্রথমে ঐ ব্যক্তিকে পানি দাও।' তাঁহার নিকট আমি যাইতে না যাইতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপর আমি হযরত হেশামের (রা) নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম তিনিও ইন্তিকাল করিয়াছেন। অনন্তর আমার ভ্রাতার নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম তাঁহারও প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।"

বুযুর্গদের উক্তি এই যে, হযরত বিশ্রে হাফী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি ব্যতীত অপর কেহই যে অবস্থায় দুনিয়াতে আসিয়াছে অবিকল সেই অবস্থায় পরলোকগমন করিতে পারে নাই। হযরত বিশ্রে হাফীর (রা) অন্তিমকালে একজন ফকীর আসিয়া কিছু প্রার্থনা করিল। পরিধানের জামাটি ব্যতীত তখন তাঁহার আর কিছুই ছিল না। তিনি তৎক্ষণাত জামাটি খুলিয়া ফকীরকে দান করিলেন। তৎপর তিনি অপরের নিকট হইতে একটি জামা ধার লইয়া পরিধানপূর্বক ইন্তিকাল করিলেন।

দানশীলতা এবং কৃপণতার সীমা

দাতা এবং কৃপণের প্রকৃত পরিচয়

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, দুনিয়াতে প্রত্যেকেই নিজেকে দাতা বলিয়া মনে করে; অথচ অপর লোকের নিকট হয়ত সে কৃপণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই জন্যই কৃপণতার প্রকৃত পরিচয় লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ ইহা অন্তরের একটি কুৎসিত রোগ। রোগ-নির্ধারণ করিতে পারিলেই চিকিৎসা সহজ হইয়া উঠে। যে যাহা চায় তাহাই দান করিতে পারে, এইরূপ লোক কেহই নাই। অন্যে যাহা চায় তাহা দিতে অক্ষম হইলেই যদি কৃপণ হইতে হয়, তবে দুনিয়ার সকল লোকই কৃপণ বলিয়া অভিহিত হইবে।

কৃপণের পরিচয়—এই সম্পর্কে বুযুর্গগণের বহু উক্তি রহিয়াছে। অধিকাংশের অভিমত এই যে, শরীয়তের বিধান মতে যাহার উপর যে দ্রব্য দান করা ওয়াজিব, সে তাহা না দিলেই তাহাকে কৃপণ বলিয়া গণ্য করা হইবে। কিন্তু এই অভিমত ঠিক নহে। আমাদের মতে রুটি এবং গুশত বিক্রেতা ওজনে সামান্য কম দিলে যে ব্যক্তি উহা ফেরত দেয় তাহাকেই কৃপণ বলে। তদ্রুপ স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণ-পোষণের জন্য নির্ধারিত খরচের অতিরিক্ত যে কিছুই দেয় না সেও কৃপণ। কেহ খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে লইয়া খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় কোন ফকীর আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে না দিয়া খাদ্যদ্রব্য ঢাকিয়া রাখাও কৃপণতা; কারণ কৃপণ ব্যক্তি যাহা দিতে সমর্থ তাহা প্রদান করা হইতে বিরত থাকাকেই শরীয়তে কৃপণতার সীমা নির্ধারিত হইয়াছে; যেমন আল্লাহ্ বলেন–

اِنْ يَّسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ

"যদি তিনি তোমাদের নিকট উহা (সেই ধনসমূহ) চাহেন, অনন্তর তোমাদের সমুদয় ধন লইয়া লন তবে তোমরা কৃপণতা করিতে থাকিবে এবং তোমাদের অসৎ

সংকল্প (কৃপণতা) প্রকাশ হইয়া যাইবে।" (সূরা মুহাম্মদ, ৪ রুকূ, ২৬ পারা।) সুতরাং সমুদয় ধন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। অতএব অভ্রান্ত অভিমত এই যে, দেওয়ার যোগ্য বস্তু না দেওয়াকেই কৃপণতা বলে।

দাতার পরিচয়—ধন সৃষ্টির পশ্চাতে আল্লাহ্‌র এক গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। অতএব তাহার মঙ্গলময় বিধান মতে যখন দান করা উচিত তখন দানে বিরত থাকাই কৃপণতা। শরীয়ত ও মনুষ্যত্ব যাহা দিবার নির্দেশ দান করে তাহাই দিতে হইবে। শরীয়ত মতে যাহা দান করা ওয়াজিব তাহা নির্ধারিত আছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মর্যাদা রক্ষার্থ দানের সীমা ব্যক্তি বিশেষের অবস্থা ও ধনের পরিমাণ অনুসারে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ অনেক বিষয় আছে যাহা ধনীদের অভ্যাসানুসারে কুৎসিত বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু দরিদ্রের দৃষ্টিতে উহা মন্দ নহে। আত্মীয়-স্বজনের জন্য যাহা নিন্দনীয় অপরের জন্য তাহা দূষণীয় নহে। বন্ধুদের সহিত ব্যবহারে যাহা কুৎসিত তাহা সম্পর্কহীন অপরিচিত ব্যক্তিদের সহিত ব্যবহারে কুৎসিত নহে। অতিথি আপ্যায়নে যাহা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা মন্দ নহে। বৃদ্ধের নিকট যাহা জঘণ্য, যুবকের নিকট তাহা জঘণ্য নহে। আবার পুরুষদের নিকট যাহা মন্দ, নারীগণের নিকট তাহা মন্দ নহে। কোন সময় ধন সঞ্চয় করা বাঞ্ছনীয় হইলেও যখন ব্যয় করিবার তদপেক্ষা অধিক আবশ্যকতা দেখা দেয়, তখন ব্যয় না করা কৃপণতার মধ্যে গণ্য। কিন্তু যখন সঞ্চয় করা আবশ্যক তখন ব্যয় করাকে অপচয় বলে। আর কৃপণতা ও অপচয় উভয়টিই দূষণীয়। কোন অতিথি আগমন করিলে তাহার খাতির ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা অর্থ ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ধনের যাকাত দিলে আর অতিথি সৎকার করিতে হইবে না বলিয়া মনে করা অতি কুৎসতি কর্ম। কাহারও অতিরিক্ত ধন থাকা সত্ত্বেও তাহার পাড়া-প্রতিবেশী অনাহারে থাকিলে সেই ব্যক্তি কৃপণের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়ত ও মনুষ্যত্বের দাবী অনুসারে অত্যাবশ্যক খরচাদি করার পরও প্রচুর ধন অবশিষ্ট থাকিলে সওয়াব লাভের আশায় অতিরিক্ত দান-খয়রাত করা কর্তব্য। অপরপক্ষে আকস্মিক বিপদাপদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখাও আবশ্যক। কিন্তু ধন সঞ্চয় কার্যকে পরকালের সওয়াবের উপর প্রাধান্য দেওয়া বুযুর্গগণের দৃষ্টিতে কৃপণতার মধ্যে গণ্য। তবে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে ইহা কৃপণতা নহে, কারণ, তাহাদের দৃষ্টি অধিকাংশ সময় দুনিয়ার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। মোটের উপর সঞ্চয় ও দান উভয়টিই ব্যক্তি বিশেষের অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হইতে থাকে।

দানশীলতা ও কৃপণতার সীমা—শরীয়ত ও মনুষ্যত্বের নির্দেশ অনুসারে যাহা ওয়াজিব তাহা দান করিলেই কৃপণতা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তবে ইহার অতিরিক্ত দান না করিলে কেহই দানশীলতার মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। তৎপর যে যত অধিক দান করিবে সে তত অধিক দানশীলতার মর্যাদা লাভ করিবে এবং সেই

পরিমাণে তাহার সওয়াবও বৃদ্ধি পাইবে। দানকার্য সহজসাধ্য না হইয়া ইহাতে মনঃকষ্ট হইলে এইরূপ দাতাকে দানশীল বলা চলে না। আর কেহ ধন্যবাদ এবং প্রশংসা পাওয়ার আশায় দান করিলে সেও দানশীলতার মর্যাদা পাইবে না।

প্রকৃত দানশীল—বাস্তব পক্ষে যিনি বিনা স্বার্থে দান করেন, তিনিই প্রকৃত দানশীল। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত এইরূপ দানশীল হওয়া আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে যে ব্যক্তি একমাত্র পারলৌকিক সওয়াবের আকাংখায় দান করে তাহাকেই আমরা রূপকভাবে দানশীল বলিব; কেননা সে পার্থিব কোন বিনিময় চায় না। ইহাই দুনিয়ার দানশীলতা। অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রেমে আসক্ত হইয়া, এমন কি পারলৌকিক সওয়াবের আশা না করিয়া বিনা দ্বিধায় হৃষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় জীবন বিসর্জন দিতে পারে, তাহাকেই ধর্ম-পথে দানশীল বলে। কারণ, কোন দ্রব্যের লালসায় দান করিলে ইহাই দানের বিনিময় হইয়া পড়ে এবং তখনই দানশীলতা বিনষ্ট হইয়া যায়।

কৃপণতা হইতে অব্যাহতির উপায়—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, জ্ঞানমূলক ও অনুষ্ঠানমূলক উপায়ে কৃপণতা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

কৃপণতা বিনাশক জ্ঞানমূলক উপায়—প্রথমে কৃপণতার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে, কেননা রোগের কারণ অবগত না হইলে ইহার চিকিৎসা করা চলে না। প্রবৃত্তি যাহা চায় তৎপ্রতিই আকৃষ্ট হওয়া কৃপণতার প্রথম কারণ; কেননা ধন ব্যতীত মানুষের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ হইতে পারে না। দীর্ঘ পরমায়ুর কামনা কৃপণতার অপর কারণ; কেননা কৃপণ ব্যক্তি যদি জানে যে, সে এক মাস বা এক বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকিবে না তবে তাহার পক্ষে ধন ব্যয় করা সহজসাধ্য হয়। কৃপণতার তৃতীয় কারণ সন্তান-সন্ততি। স্বয়ং দীর্ঘ জীবনের আশা করিলে মানুষ যেমন কৃপণ হইয়া পড়ে, তাহার সন্তান-সন্ততি থাকিলে সুখ-স্বচ্ছন্দে তাহাদের জীবন যাপনের উপায় করিয়া দিতে যাইয়া মানুষ ততোধিক কৃপণ হইয়া উঠে। কারণ, স্বীয় সন্তান-সন্ততির স্থায়িত্বকে লোকে নিজের স্থায়িত্ব বলিয়াই বিবেচনা করে। এই জন্যই রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "সন্তান-সন্ততি মানুষের কৃপণতা, কাপুরুষতা ও অজ্ঞতার কারণ হইয়া থাকে।"

আবার কোন কোন সময় ধনাসক্তির দরুন মানব হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। কখন কখন আবার ধনাশক্তি লোভ-লালসা চরিতার্থের জন্য হয় না; বরং স্বয়ং ধনের প্রতিই মানুষ আসক্ত হইয়া পড়ে। (এমতাবস্থায়, কৃপণ ব্যক্তি সমস্ত জীবন একমাত্র ধন সঞ্চয়েই ব্যাপৃত থাকে।) সঞ্চিত ধন-সম্পত্তির আয় তাহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য যথেষ্ট; তথাপি কৃপণ ব্যক্তি পীড়িত হইলে চিকিৎসার জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করে না। আর সে যাকাতও দেয় না এবং সমস্ত ধন মাটির নীচে প্রোথিত করিয়া

রাখে। অথচ সে জানে যে, একদিন অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া তাহার জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া দিবে এবং তাহার সঞ্চিত ধনও তাহার শত্রুদের হস্তগত হইবে। কিন্তু তবুও কৃপণতা তাহাকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হইতে বিরত রাখে। যে ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সে অত্যন্ত কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত, তাহার আরোগ্য লাভের আশা দুরাশামাত্র।

কৃপণতার কারণসমূহ অবহিত হওয়ার পর ইহা বিনাশের উপায় অবলম্বন কর। অল্পে তুষ্ট থাক এবং ধৈর্যধারণপূর্বক অভিলাষিত বস্তুর কামনা পরিহার কর। তাহা হইলে তুমি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যে, ধনের প্রতি তোমার কোন লক্ষ্যই থাকিবে না। দীর্ঘ পরমায়ুর কামনাজনিত কৃপণতা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে মৃত্যু চিন্তা অধিক কর। একবার অনুধাবন কর তোমারই মত কত মানুষ পরকাল সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিল; অতর্কিতভাবে মৃত্যু আসিয়া তাহাদের জীবনের যবনিকাপাত করিল এবং অপরিসীম দুঃখ-যাতনা ব্যতীত পরকালের সম্বল আর কিছুই তাহারা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিল না। আর শত্রুগণ তাহাদের মৃত্যুতে মৌখিক শোক প্রকাশ করত তাহাদের ধনসম্পদ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইল। তোমার সন্তান-সন্ততির অভাব-অনটন হইতে অব্যাহতির উদ্দেশ্যেও তাহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার চলিবার উপায় করিবার জন্য যদি তুমি কৃপণতা অবলম্বন করিয়া থাক, তবে বুঝিয়া লও, যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই তাহাদের জীবিকার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং একমাত্র তাঁহার উপরই ভরসা কর। তাহাদের অদৃষ্টে দরিদ্রতা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে তোমার কৃপণতায় তাহারা সম্পদশালী হইতে পারিবে না। তুমি অগাধ ধন রাখিয়া গেলেও তাহারা ইহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে। আর তাহাদের অদৃষ্টে ধন থাকিলে যে কোন স্থান হইতেও হউক না কেন, ইহা স্বতঃই তাহাদের হস্তে আসিয়া সংগৃহীত হইবে। এইরূপ বহু ধনীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাদের পিতৃপুরুষদের এক কপর্দকও লাভ করে নাই। অপরপক্ষে, এমন লোকও বিরল নহে, যে অতুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও যথাসর্বস্ব বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে দীনহীন পথের ভিখারী সাজিয়াছে।

প্রিয় পাঠক, দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর, সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ হইলে আল্লাহ্‌ই তাহাদের অভাব মোচন করিবেন। আর সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নাফরমান হইলে দীনহীন দরিদ্র হওয়াই তাহাদের পক্ষে যুক্ত সঙ্গত; তাহা হইলে পাপকার্যে ধনের অপচয় হইবে না। তৎপর দানশীলতার প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা সম্বন্ধে যে সকল হাদীস রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ কর এবং বুঝিয়া লও যে, কৃপণ যত বড় আবিদই হউক না কেন, তাহার স্থান দোযখ ব্যতীত আর কোথাও নাই। সৎকার্যে ধন ব্যয় করত মানুষ নিজকে দোযখের অগ্নি ও আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা করিবে, এতদ্ব্যতীত ধনের আর কি উপকারিতা আছে? কৃপণের অবস্থার

প্রতিও একবার অনুধাবন কর। লোকচক্ষে সে মন্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; সকলেই তাহাকে স্বীয় শত্রু বলিয়া গণ্য করে এবং তাহার দুর্নাম রটনা করে। ভালরূপে স্মরণ রাখ, কৃপণতা করিলে লোক তোমাকেও মন্দ বলিয়া জানিবে এবং তাহাদের দৃষ্টিতে তুমি হেয় হইয়া পড়িবে।

কৃপণতা বিনাশক অনুষ্ঠানমূলক উপায়—উল্লিখিত কথাসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করিলে যদি বুঝিতে পার যে, কৃপণতা রোগে ঐ ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এবং ধন খরচের বাসনা হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই অনুষ্ঠানমূলক উপায় অবলম্বন করিবে। দানের কথা মনে হওয়া মাত্রই দান করিতে আরম্ভ করিবে। হযরত আবুল হাসান আবু সাবহা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি একদা পায়খানার ভিতর হইতে স্বীয় শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন– "আমার পিরহানটি লও এবং অমুক ফকীরকে দান কর।" শিষ্য নিবেদন করিল– "হে শায়খ, পায়খানা হইতে বাহির হইয়াও ত আপনি এই আদেশ দিতে পারিতেন? এই সময় পর্যন্ত আপনি ধৈর্যধারণ করিয়া রহিলেন না কেন?" তিনি বলিলেন– "মনে অন্য ভাব উদয় হইয়া আমাকে এই দান কার্য হইতে বিরত রাখে কিনা আমার এই আশঙ্কা হইয়াছিল।" মোটের উপর ধন খরচ না করিলে কৃপণতা বিদূরিত হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলে প্রেমাসক্তির যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না তদ্রূপ বিতরণপূর্বক ধন হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলে ধানসক্তি হইতে মুক্তি পাওয়াও সম্ভবপর নহে। কৃপণতাবশত ধন সঞ্চয় করা অপেক্ষা ধনাসক্তি হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে ইহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা বহুগুণে ভাল।

কৃপণতা অপসারণের কৌশল—কৃপণতা অপসারণের একটি সূক্ষ্ম কৌশল ও নির্দোষ উপায় এই যে, তুমি নিজকে যশোলুব্ধ করিয়া তুলিবে এবং মনে মনে নিজকে বলিবে–"খুব দান করিতে থাক, তাহা হইলে লোকে তোমাকে দানশীল বলিয়া মনে করিবে এবং তোমার যশ কীর্তন করিবে।" এইরূপে সম্মান লিপ্সাকে ধন লিপ্সার উপর চাপাইয়া দিবে। এই কৌশলে ধন লিপ্সা অপসারিত হইলে তখন রিয়া দূর করিবার উপায় অবলম্বন করিবে। শিশুকে মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইবার কৌশলের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে; যেমন– শিশু একটু বড় হইয়া উঠিলে মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে এমন বস্তুর আস্বাদনে লাগানো হয় যাহাতে সে আনন্দ পায় ও মাতৃস্তন ভুলিয়া থাকে। মানব হৃদয়ে যে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি জন্মে উহা দমনের একটি অতি সুন্দর উপায় এই যে, একটি কুপ্রবৃত্তির উপর অপর একটি কুপ্রবৃত্তি চাপাইয়া দিবে। এইরূপে একটির প্রভাবে অপরটি বিলুপ্ত হইবে। একটি উপমা দ্বারা ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে। মনে কর, বস্ত্রে রক্তের দাগ লাগিয়াছে এবং পানি দ্বারা ধৌত করিলে ইহা উঠিতেছে না। এমতাবস্থায়, বস্ত্রটি পেশাব দ্বারা ধৌত করিলে ইহার ক্ষার জাতীয় পদার্থের কারণে বস্ত্রের দাগ উঠিয়া যাইতে পারে। আর বস্ত্রটি

তখন পানি দ্বারা ধৌত করিয়া লইলেই পাক হইয়া যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা তখনই ফলপ্রদ হইবে যখন রিয়া তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হয় না।

যদিও কৃপণতা এবং সম্মান লিপ্সা মানব-প্রকৃতির সহিত জড়িত রহিয়াছে, কিন্তু জানিয়া রাখ, মানব-প্রকৃতির অলিগলি আবর্জনা পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় স্থানও আছে, আবার পুষ্পোদ্যানও আছে। কৃপণতা এই আবর্জনা পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় স্থান, আর দানশীলতা পুষ্পোদ্যান। রিয়া ও সুনামের লালসায় দান করা হারাম নহে; কারণ, শুধু ইবাদত কার্যেই রিয়া হারাম। অতএব নিজ দোষ চাপিয়া রাখার জন্য কৃপণের পক্ষে ইহা বলা শোভা পায় না যে, অমুক ব্যক্তি রিয়া বশত দান করিয়া থাকে। কেননা, পুষ্পোদ্যানে থাকা যেমন আবর্জনা পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় স্থানে থাকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তদ্রূপ কৃপণতার দরুণ দান হইতে বিরত থাকা অপেক্ষা রিয়ার বশীভূত হইয়া দান করা উৎকৃষ্ট। উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা কৃপণতা অপসারণের উপায়, অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টে হইলেও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে দান করত ইহার অভ্যাস করিয়া লইতে হইবে।

মুরীদের কৃপণতা দূরীকরণে পীরের ব্যবস্থা—কোন কোন কামিল পীর স্বীয় মুরীদগণের কৃপণতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই উপায় অবলম্বন করিতেন যে, তাঁহার প্রত্যেক মুরীদকে অবস্থানের জন্য পৃথক পৃথক নির্জন কক্ষ নির্ধারিত করিয়া দিতেন, যেন সেই নির্ধারিভ কক্ষের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। মুরীদের মন কক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে তাহাকে অন্য কক্ষে স্থানান্তরিত করিয়া অপরকে তাহার কক্ষ দেওয়া হইত। মুরীদকে সুন্দর জুতা পরিধান করিতে দেখিয়া পীর যদি বুঝিতেন যে, উহা তাহার নিকট উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে তবে সেই জুতা অপরকে দান করিবার আদেশ করিতেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার স্বীয় পাদুকা মুবারকে নতুন ফিতা লাগাইলেন। নামাযের সময় এই ফিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইলে তিনি বলিলেন–"সেই পুরাতন ফিতা আনয়ন কর।" তৎপর হযরত (সা) নুতন ফিতাটি খুলিয়া পাদুকাতে ঐ পুরাতন ফিতা লাগাইয়া লইলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই কার্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই ধনাসক্তি দূর করিবার উপায়। কারণ, কোন বস্তু হইতে শারীরিক বিচ্ছেদ না ঘটিলে ইহার ভালবাসা অন্তর হইতে লোপ পায় না। দরিদ্রের হস্তে ধন নাই বলিয়াই তাহার অন্তর প্রশস্ত ও উদার। কিন্তু আবার তাহার হস্তে কিছু ধন সঞ্চিত হইলেই সে কৃপণ হইয়া পড়ে। মানুষের হাতে যে বস্তু নাই উহার প্রতি তাহার হৃদয়ও উদাসীন থাকে।

একটি কাহিনী—এক ব্যক্তি কোন বাদশাহ্‌কে একটি ফিরোজা রত্নখচিত মূল্যবান পেয়ালা উপহারস্বরূপ প্রদান করিল। ইহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ও অতুলনীয় ছিল। বাদশাহ্‌র দরবারে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন–"এই পেয়ালা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ?" তিনি বলিলেন–"আমি দেখিতেছি, এই পেয়ালা পরিণামে আপনাকে দুঃখ দিবে অথবা অভাবে ফেলিবে। ইহা হস্তগত হওয়ার পূর্বে আপনি এই উভয় অবস্থা হইতে নিশ্চিত ছিলেন।" বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন–"আচ্ছা, কিরূপে ইহা ঘটিবে ?" জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন–"ইহা ভাঙ্গিয়া গেলে আপনি দুঃখ পাইবেন, কেননা ইহা অতুলনীয়। আর ইহা চোরে অপহরণ করিলে আপনি ইহার অভাব অনুভব করিবেন।" ঘটনাচক্রে পেয়ালাটি একদিন ভাঙ্গিয়া গেল। বাদশাহ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন– "সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সত্যই বলিয়াছিলেন।"

ধনরূপ বিষের মন্ত্র

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, ধনকে সর্পের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কেননা উপরের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারিয়াছ যে, সর্পের ন্যায় ধনে বিষ ও ইহার প্রতিষেধক উভয়ই রহিয়াছে। যে ব্যক্তি মন্ত্র না শিখিয়া সাপ ধরিতে যায় সে-ই নিজকে ধ্বংস করিবে। ধন যে সম্পূর্ণরূপে মন্দ তাহা নহে, ইহাতে কতিপয় উপকারিতাও রহিয়াছে। এইজন্যই হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ প্রমুখ সাহাবা (রা) ধনবান ছিলেন। ধনবান হওয়া দূষণীয় নহে। কিন্তু কোন বালক সাপুড়িয়াকে সাপ ধরিয়া পেটরায় রাখিতে দেখিয়া যদি মনে করে যে, সর্পের স্নিগ্ধতা ও ইহার স্পর্শসুখ লাভের উদ্দেশ্যেই সাপুড়িয়া সাপ ধরিতেছে এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সেই বালকও সাপ ধরিবার দুঃসাহস করে, তবে বিষধর সর্প-দংশনে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। ধনরূপ বিষের পাঁচটি মন্ত্র আছে।

প্রথম মন্ত্র—আল্লাহ্ কর্তৃক ধন সৃজনের কারণ অবগত হওয়া। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আহার, পোশাক ও আবাসের জন্য ধনের প্রয়োজন। মানবদেহ রক্ষার্থে এই সকল বস্তু অপরিহার্য এবং ইন্দ্রিয় ধারণার্থ দেহের আবশ্যক। বুদ্ধি সংরক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। বুদ্ধিকে আবার হৃদয়ের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে যেন হৃদয় তদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভে সমর্থ হয়। ইহা সম্যকরূপে অবগত হইলে মানব কেবল অভাব মোচন-উপযোগী ধন উপার্জনে মনোনিবেশ করিবে এবং সৎকার্যে পরিমিতভাবে ব্যয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে।

দ্বিতীয় মন্ত্র—ধনাগমনের পন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা, যেন উপার্জিত ধন হারাম ও সন্দেহযুক্ত এবং মানবোচিতভাবের পরিপন্থী না হয়; যেমন– ঘুষ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং হাম্মামখানার উপার্জিত ধন গ্রহণ ইত্যাদি।

তৃতীয় মন্ত্র—প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় না করা। স্বীয় অভাব মোচন ও ধর্ম-পথে ব্যয়ের জন্য যাহা আবশ্যক তদতিরিক্ত ধন অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য বলিয়া মনে

করিবে। কোন অভাবগ্রস্থ লোক আগমন করিলে তদতিরিক্ত ধন তাহাকে দান করিয়া দিবে, সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না। নিজের প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তোমার যথাসর্বস্ব অপরের অভাব মোচনের জন্য দান করিতে যদি অক্ষম হও, তবে ব্যয়ের উপযোগী স্থানে অবশ্যই ব্যয় করিবে।

চতুর্থ মন্ত্র—মিতব্যয়িতা। পরিমিত ব্যয় করিবে, কখনও অপব্যয় করিবে না। অল্পে পরিতুষ্ট থাকিবে এবং সৎকার্যে ব্যয় করিবে। কেননা, অন্যায়ভাবে উপার্জন যেমন অবৈধ, অন্যায়ভাবে খরচও তদ্রূপ অবৈধ।

পঞ্চম মন্ত্র—বিশুদ্ধ সংকল্প। উপার্জন, ব্যয় ও সঞ্চয় করিতে নিয়ত ঠিক রাখিবে। শুধু ইবাদতকার্যে অবকাশ ও সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে ধনার্জন করিবে। যে ধন তুমি অর্জন কর তাহা যেন একমাত্র দুনিয়ার প্রতি তোমার ঘৃণা ও তোমার বৈরাগ্য ভাবের জন্যই হয়। তাহা হইলে দুনিয়ার চিন্তা হইতে তোমার মনকে পবিত্র ও মুক্ত রাখিয়া তুমি আল্লাহ্‌র যিকিরে মনোনিবেশ করিতে পারিবে। আর যাহা তুমি সঞ্চয় কর তাহা কেবলমাত্র ধর্মপথে ব্যয়, ধর্মকার্যে অবকাশ ও সুযোগ লাভ এবং ভবিষ্যতে কোন কঠিন সঞ্চিত ধন ব্যয়ের জন্য সর্বদা উপযুক্ত সময় ও স্থানে প্রতিরক্ষায় থাকিবে। উপযুক্ত সময় ও স্থান দেখিলেই ইহা ধরিয়া রাখিয়া ব্যয় করিয়া ফেলিবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য করিলে ধনে মানুষের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। তখন ধন বিষতুল্য হয় না; বরং এমতাবস্থায় ইহাকে বিষের প্রতিষেধকস্বরূপ গণ্য করা হয়। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হযরত আলী করারামাল্লাহু অজ্‌হাহু বলেন–"কোন ব্যক্তি সমস্ত জগতের ধন লাভ করিয়া সংসারে অদ্বিতীয় ধনী হইলেও সে সংসারবিরাগী (যদি তাহার ধনলাভ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে), আর যে ব্যক্তি সমস্ত জগত পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইহা করা হয় নাই, তবে সে ব্যক্তি সংসারবিরাগী নহে।" তোমার মনকে সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদত ও পরকালের দিকে নিবিষ্ট রাখিবে। তাহা হইলে তোমার সমস্ত গতিবিধি, কাজ-কারবার এমন কি আহার, পায়খানায় যাতায়াত ইত্যাদি কার্য ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং এই সকল কার্যে সওয়াবও লাভ করিবে, কারণ, ধর্ম-পথে চলিতে হইলে এই সমস্তেরও আবশ্যকতা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষের যাবতীয় কার্য ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, একমাত্র বিশুদ্ধ সংকল্পের উপরই নির্ভর করে।

অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় না করাই উত্তম—অধিকাংশ লোকই সংকল্প বিশুদ্ধ করিতে পারে না এবং উল্লিখিত বিষমন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। আর কেহ কেহ জ্ঞাত থাকিলেও উহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে না। সুতরাং যথাসম্ভব ধন হইতে দূরে সরিয়া থাকাই উত্তম ব্যবস্থা। কারণ, অতিরিক্ত ধন ব্যক্তিবিশেষকে গর্বিত ও আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে অন্যমনস্ক করিতে না পারিলেও ইহার দরুন সে পরকালে উচ্চ মর্যাদা

লাভে বঞ্চিত থাকে। ইহা তাহার পক্ষে অপরিসীম ক্ষতি। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু অতুল ধন-সম্পদ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহা দেখিয়া জনৈক সাহাবী (রা) বলেন–"প্রচুর ধন-সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার ভয় হইতেছে।" ইহা শুনিয়া হযরত কা'ব আহ্‌বার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"সুব্‌হানাল্লাহ্‌, তোমরা ভয় কর কেন ? তিনি বৈধ উপায়ে ধন অর্জন করিয়াছেন এবং সঠিকভাবে উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট সম্পত্তিও বৈধভাবে অর্জিত। এমতাবস্থায়, তাঁহার জন্য ভয় কি ?" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উটের একটি হাড় হস্তে গৃহের বাহির হইলেন এবং প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে হযরত কা'ব আহ্‌বারকে (রা) অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পালাইয়া গিয়া হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর গৃহে আশ্রয় লইলেন। হযরত আবূ যরও (রা) তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরত কা'ব আহ্‌বারকে (রা) সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে য়াহূদী তনয়, তুমি বলিতেছ–হযরত আবদুর রহমান যে ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন উহাতে কি ক্ষতি ? একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম ওহূদ পর্বতের দিকে গমন করিতেছিলেন; আমি তাঁহার সহিত ছিলাম। তিনি বলিলেন- 'হে আবূ যর।' আমি উত্তর দিলাম- 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি।' তিনি বলিলেন- 'যে ব্যক্তি ডানে-বামে, অগ্র-পশ্চাতে ধন বিতরণ করিয়া দেয় এবং সৎকার্যে ব্যয় করে, এমন লোক ব্যতীত সকল ধনী ব্যক্তির মর্যাদাই পরকালে সর্বাপেক্ষা কম হইবে এবং তাহারা সর্বশেষে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। হে আবূ যর, আমি পছন্দ করি না যে, আমার কয়েকটি ওহূদ পর্বত পরিমিত ধন হউক, আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় আমি ব্যয় করি এবং আমার পরলোকগমনের সময় দুই কিরাত (প্রায় ছয় পয়সা) পরিমিত ধন অবশিষ্ট থাকুক।' রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন এই কথা বলিয়াছেন তখন হে য়াহূদীর সন্তান, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য নহে।" উপস্থিত সকলেই হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর কথাগুলি শুনিলেন' কিন্তু কেহই কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না।

এক দিনের ঘটনা। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর তেজারতী উষ্ট্রদল পণ্যসম্ভার লইয়া য়ামন হইতে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করিলে মদীনাতে ধুমধাম পড়িয়া গেল। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকে ঐ উষ্ট্রদলের আগমনবার্তা জানাইল। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন- "রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বাণী সত্যে পরিণত হইল।" ইহা শ্রবণে কৌতূহলী হইয়া হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ তৎক্ষণাৎ হযরত আয়েশার (রা) নিকট গমনপূর্বক নিবেদন করিলেন- "হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কি বলিয়াছিলেন?" তিনি উত্তরে

বলিলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন- 'আমাকে বেহেশ্‌ত দেখানো হইল। দেখিলাম, আমার সাহাবাগণের মধ্যে যাহারা দরিদ্র তাহারা দৌড়াইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতেছে। আর আবদুর রহমান ইবনে আওফকে ব্যতীত আমার ধনী সাহাবাদের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সে হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে বেহেশতের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিল।" ইহা শুনিয়া হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলিলেন- "আল্লাহ্ যেন আমাকে ঐ দরিদ্র সাহাবাগণের সহিত বেহেশ্‌তে প্রবেশের সৌভাগ্য দান করেন, এই উদ্দেশ্যে আমার সমস্ত উট উহাদের পৃষ্ঠের পণ্যসম্ভারসহ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করিয়া দিলাম এবং গোলামদিগকে মুক্ত করিলাম।" একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে (রা) লক্ষ্য করিয়া বলেন-"আমার উম্মতের সকল ধনীর মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে; কিন্তু বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে।"

কিয়ামতে ধনী ব্যক্তির হিসাব-নিকাশ—একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী (রা) বলেন- "প্রত্যহ যদি বৈধ উপায়ে আমার সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপার্জিত হয় এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় ইহা ব্যয় করিতে পারি, অথচ ইহার দরুন নামাযের জামা'আত হইতে আমাকে বঞ্চিত থাকিতে না হয়, তথাপি এইরূপ উপার্জন আমি পছন্দ করি না।" লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন- 'হে বান্দা, তুমি কোথা হইতে অর্জন করিয়াছ এবং কোথায় খরচ করিয়াছ।' এই প্রশ্নের উত্তর ও হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন- 'কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে, যে অবৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করিয়া অবৈধ কার্যে অপচয় করিত। তাহাকে দোযখে পাঠানো হইবে। তৎপর অপর এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে। সে বৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করিয়া অবৈধ কার্যে ব্যয় করিত। তাহাকেও দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহার পর তৃতীয় এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে। সে অবৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করিয়া বৈধ কার্যে ব্যয় করিত। তাহাকেও দোযখে পাঠানো হইবে। অনন্তর চতুর্থ এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে। সে বৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করিয়া বৈধ কার্যে ব্যয় করিত। তাহাকেও দোযখে পাঠানো হইবে। অনন্তর চতুর্থ এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে। সে বৈধ উপায়ে ধন অর্জন করিয়া বৈধ কার্যেই ব্যয় করিত। তাহাকে থামাইতে আদেশ করা হইবে। কারণ, সে হয়ত ধন উপার্জনে লিপ্ত থাকিয়া পবিত্রতা সাধনে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়াছে বা যথারীতি রুকু ও সিজদা সম্পন্ন করে নাই বা যথাসময়ে নামায আদায় করে নাই। (এই সকল বিষয়ে তাহার নিকট হইতে তন্ন তন্ন করিয়া হিসাব গ্রহণ করা হইবে।) সেই ব্যক্তি নিবেদন করিবে- 'হে খোদা, আমি বৈধ উপায়ে ধন অর্জন করিয়া উপযুক্ত স্থানে ন্যায্যভাবে ব্যয় করিয়াছি, কোন ফরয কার্য সমাধানে কোন ত্রুটি করি নাই এবং ধন-সম্পদের কারণে কখনও গর্ব করি

নাই।' (সে এই সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাহাকে বলা হইবে, থাম) তুমি হয়ত বহু মূল্য ঘোড়া রাখিয়াছ এবং উত্তম বসন-ভূষণ পরিধান করিয়াছ ও গর্বভরে বিচরণ করিয়াছ। সেই ব্যক্তি নিবেদন করিবে-'হে খোদা, ধন লাভ করিয়া আমি কখনও আত্মগর্ব প্রকাশ করি নাই।' তখন তাহাকে বলা হইবে-'হয়ত তুমি কোন য়াতীম, দরিদ্র, প্রতিবেশী বা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির প্রতি তোমার কর্তব্য যথাযথ পালন কর নাই।' সেই ব্যক্তি নিবেদন করিবে- 'হে খোদা, আমি বৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করিয়া হক পথে ব্যয় করিয়াছি। আর কোন ফরয কার্যেও আমার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় নাই।' এমন সময় বহু লোক আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবে এবং নিবেদন করিবে- 'হে খোদা, আমাদের মধ্যে এই ব্যক্তিকে আপনি ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলেন, সে আমাদের হক ঠিকভাবে আদায় করিয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করুন।' তৎপর তাহাকে প্রত্যেকের হক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। যদি উহাতেও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হইয়া থাকে তবে তাহাকে আদেশ করা হইবে- দাঁড়াও এবং বল, আমি তোমাকে যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলাম, উহার কি শুকরিয়া আদায় করিয়াছ?' কিয়ামতের দিন ধনী ব্যক্তিকে এবং বিধ প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করা হইবে। হক পথে আয়-ব্যয় করিলে ধনলাভের জন্য কোন শাস্তির বিধান না থাকিলেও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়াদিরও হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া কোন বুযুর্গ সম্পদশালী হইতে সম্মত হন নাই।

দরিদ্রতার মহান আদর্শ—দরিদ্রতা অবলম্বন করাই যে উত্তম, বিশ্ববাসীকে ইহা বুঝাইবার জন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাস দরবারে হাযির হইবার আমার অবাধ অধিকার ছিল। একদা তিনি আমাকে বলিলেন- 'ফাতিমা (রা) পীড়িত; চল তাঁহাকে দেখিয়া আসি।' আমরা তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে হযরত (সা) দ্বারে করাঘাতপূর্বক বলিলেন- "আসসালামু আলায়কুম, আমরা গৃহে প্রবেশ করিব কি? হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা নিবেদন করিলেন- 'আসুন।' হযরত (সা) বলিলেন- 'আমার সহিত আরও এক ব্যক্তি আছে।' হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন- 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা), আমার পরিধানে একটি পুরাতন কম্বল ব্যতীত আর কোন বস্ত্র নাই।' তিনি বলিলেন- 'এই কম্বল দ্বারাই স্বীয় শরীর ঢাকিয়া লও।' হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন- 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা সমস্ত শরীরে জড়াইয়া রাখিয়াছি; কিন্তু (ইহা এত ক্ষুদ্র যে) মস্তক অনাবৃত রহিয়াছে।' ইহা শুনিয়া হযরত (সা) স্বীয় পুরাতন চাদর মুবারক তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া তদ্‌দ্বারা মস্তক ঢাকিয়া লইতে বলিলেন। তৎপর

তিনি গৃহে প্রবেশ করত জিজ্ঞাসা করিলেন- "হে স্নেহের সন্তান, কেমন আছ?' হযরত ফাতিমা (রা) নিবেদন করিলেন- 'অত্যন্ত পীড়িত ও ব্যথাতুর আছি। এইরূপ পীড়িতাবস্থায় আবার ক্ষুধার্ত রহিয়াছি, এইজন্যই আরও অধিক কষ্ট হইতেছে। আর আহারেরও কিছুই নাই, ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য হইতেছে না।' ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন- 'হে ফাতিমা, ধৈর্যহারা হইও না। আল্লাহ্র শপথ, তিনদিন হইল আমিও কিছুই খাই নাই। আর আল্লাহ্র নিকট তোমা অপেক্ষা আমার মর্যাদা অনেক বেশী। আমি কিছু চাহিলে অবশ্যই তিনি দান করিতেন। কিন্তু আমি ইহকালের পরিবর্তে পরকাল অবলম্বন করিয়াছি।' তৎপর তিনি হযরত ফাতিমার (রা) স্কন্ধের উপর স্বীয় হস্ত মুবারক স্থাপনপূর্বক বলিলেন- 'সুসংবাদ শ্রবণ কর যে, আল্লাহ্র শপথ, তুমি বেহেশ্তে নারীকুলের সরদার হইবে।' হযরত ফাতিমা (রা) নিবেদন করিলেন 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা), ফিরআউন পত্নী আসিয়া ও হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের জননী মার্ইয়াম তবে কি হইবেন?' তিনি বলিলেন- 'তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ের নারীকুলের সরদার হইবে। তোমরা এত এক স্বর্ণরৌপ্যখচিত প্রাসাদে অবস্থান করিবে যথায় কোন গোলাম নাই, কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না ও কোন কর্মব্যবস্থতা নাই।' অনন্তর তিনি বলিলেন- ' হে স্নেহের কন্যা, আমার চাচাত ভাই- তোমার স্বামী- তোমাকে যাঁহার সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছি- যিনি ইহকালের (মানবের) সরদার- তিনি তোমার জন্য যথেষ্ট।"

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মানব ধনরূপ বিষের মন্ত্রে অতি সুনিপুণ এবং সুদক্ষ হইলেও ধনের প্রতি দৃক্পাত না করাই তাহার পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা; এমনকি ইহার নিকটবর্তী হওয়াও তাহার পক্ষে উচিত নহে। কেবল অভাব মোচন হয়, এই পরিমাণ ধন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। কারণ, সাপুড়িয়া পরিশেষে সর্প-দংশনেই প্রাণত্যাগ করে।

সপ্তম অধ্যায়

সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রতিকার এবং এতদুভয়ের বিপদসমূহ

সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার অপকারিতা- প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, বহু লোক সম্মান-লালসা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, সুখ্যাতি ও প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর এই কুপ্রবৃত্তিসমূহের কারণেই পরস্পর শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ গোনাহ্র কার্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। এই কুপ্রবৃত্তিগুলি অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষ ধর্মপথ হইতে সরিয়া যায় এবং হৃদয় তখন কপটতা ও কুস্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "বৃষ্টির পানি যেমন তৃণাদি জন্মায়, ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা তদ্রূপ মানব মনে কপটতা জন্মাইয়া থাকে।" তিনি আরও বলেন- "ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা মানব হৃদয়ের যেরূপ ক্ষতিসাধন করে, দুইটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র ছাগলের পালে পতিত হইলে তদ্রূপ ক্ষতি করিতে পারে না।" তিনি এক সময় হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে বলেন- "দুইটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে। **প্রথম**—প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং **দ্বিতীয়**—নিজের গুণ ও প্রশংসা শ্রবণের লালসা। আর যে ব্যক্তি প্রভুত্ব ও ধন চায় না এবং অজ্ঞাত থাকিতে পছন্দ করে সেই ব্যক্তিই এই আপদ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন-

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ـ

"ঐ পরকাল সেই সমস্ত লোকের জন্য আমি নির্ধারিত করিতেছি যাহারা দুনিয়াতে না উঁচু হইতে চায় এবং না ফাসাদ চায়।" (সূরা কাসাস, ৯ রুকু, ২০ পারা)।

অজ্ঞাত পরহেযগারদের মর্যাদা—রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যাহারা ধূলায় ধূসরিত, দীনহীন দরিদ্র, মলিন বস্ত্র পরিহিত এবং যাহাদিগকে কেহই সম্মান করে না, যাহারা ধনীগণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে কেহই তাহাদিগকে (গৃহে) প্রবেশের অনুমতি দেয় না, বিবাহ করিতে চাহিলে কেহই তাহাদিগকে স্বীয় কন্যা দান করিতে চায় না, কিছু বলিলে কেহই তাহাদের কথা শুনে না এবং যাহাদের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তরেই তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, তাহারাই বেহেশ্তী। কিয়ামতের দিন তাহাদের নূর বন্টন করিলে সমস্ত লোকই ইহার

অংশ পাইতে পারিবে।" তিনি আরও বলেন- "ধূলি-ধূসরিত ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত লোকদের মধ্যে অনেকে এমন আছে যে, তাহারা যদি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বেহেশ্‌ত চায় তবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বেহেশ্‌ত প্রদান করিবেন; কিন্তু উম্মতের মধ্যে বহু লোক এমনও আছে যাহারা তোমাদের নিকট একটি পয়সা বা একটি শস্যদানা চাহিলে তোমরা দিবে না। আর তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট বেহেশ্‌ত চাহিলে তিনি বেহেশ্‌ত দান করিবেন; কিন্তু দুনিয়া চাহিলে কিছুই পাইবে না। দুনিয়া না পাওয়ার কারণে তাহারা তুচ্ছ নহে।"

একদা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু মসজিদে যাইয়া দেখিলেন হযরত মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু রোদন করিতেছেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- "আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সামান্য রিয়াও শিরকের মধ্যে গণ্য এবং আল্লাহ্ এমন অজ্ঞাত পরহেযগারদিগকে ভালবাসেন যাহারা নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে কেহই তাহাদের অনুসন্ধান করে না এবং উপস্থিত থাকিলে কেহই তাহাদিগকে চিনে না। তাহারা হেদায়েতের পথের উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ এবং সমস্ত কুপ্রবৃত্তি ও আবিলতা হইতে তাহারা মুক্ত।"

সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা ধর্মপথে প্রতিবন্ধক—হযরত ইবরাহীম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- " যে ব্যক্তি সুনাম ও সুখ্যাতি প্রিয় সে আল্লাহ্‌র ধর্মে অকপট নহে।" হযরত আয়ুব আলায়হিস সালাম বলেন- "লোকের নিকট পরিচিত হওয়ার অভিলাষ না করাই অকপটতার নিদর্শন।" হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর পশ্চাতে তাঁহার একদল শিষ্য গমন করিতেছিল। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) নিবেদন করিলেন- "হে আমীরুল মুমিনীন, লক্ষ্য করুন, আপনি কি করিতেছেন।" তিনি বলিলেন- "(তোমার) এই কাজ পশ্চাতে গমনকারীদের জন্য অপমানস্বরূপ; আর অগ্রে গমনকারীর জন্য গর্ব ও অহংকারের কারণ।" হযরত হাসান বসরী (র) বলেন,- "যে নির্বোধ ব্যক্তি অপর লোককে তাহার পশ্চাতে মতন করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহার অন্তর কোনরূপেই স্থির থাকিতে পারে না।" (অর্থাৎ তাহার অন্তরে আত্মম্ভরিতা দেখা দেয়)। একদা হযরত আয়ুব আলায়হিস সালাম ভ্রমণে বহির্গত হইলে একদল লোক তাঁহার পশ্চাতে চলিতে লাগিল দেখিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- "ভক্তি ভরে আমার পশ্চাতে চলাকে আমি যে ঘৃণা করি, ইহা যদি আল্লাহ্ না জানিতেন তবে আমি তাঁহার ভয়ে ভীত হইতাম।" হযরত সাওরী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- "নতুন বা অতি পুরাতন বলিয়া যাহা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন বস্ত্র পরিধান করাকে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ মাকরূহ (ঘৃণ্য) বলিয়া মনে করিতেন। বস্ত্র এইরূপ হওয়া আবশ্যক যাহার সম্বন্ধে (ইহা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হওয়ার দরুন) কেহই কিছু বলে না।" হযরত বিশ্‌রে

হাফী (র) বলেন- "যে ব্যক্তি লোকের নিকট পরিচিত হইতে ভালবাসে, অথচ সে অপদস্ত ও তাহার ধর্ম বরবাদ হয় নাই, এমন কাহাকেও আমি জানি না।"

সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার যথার্থ পরিচয়—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, কাহারও অধিকারে যদি প্রচুর ধন সম্পদ থাকে এবং ইহা যদৃচ্ছা ব্যয় করিবার তাহার স্বাধীন ক্ষমতা থাকে এবং তাহাদিগকে যদৃচ্ছা পরিচালনের ক্ষমতাও যাহার থাকে তাহাকেই প্রতিপত্তিশালী লোক বলে। অন্তর যাহার বশীভূত হয়, ধন এবং দেহও তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে। কাহারও প্রতি যতক্ষণ এই বিশ্বাস না জন্মিবে যে, তিনি শ্রেষ্ঠ, ততক্ষণ অপর লোকের মন তাঁহার বশীভূত হইতে পারে না।

শ্রেষ্ঠত্বের কারণ—পূর্ণ গুণরাজির সমাবেশ, জ্ঞানের গভীরতা, ইবাদতের আধিক্য, সৎস্বভাবের প্রাধান্য বা অপর কোন বস্তু যাহাকে লোকে মহত্ত্বের উপকরণস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছে ইত্যাদি কারণে মানুষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লোকে যাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করে অন্তর স্বভাবতই তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। তখন লোকে আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তাহার আদেশ পালন করিয়া চলে, তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, দেহকে তাহার খেদমতে নিয়োজিত করে এবং ধন-সম্পদ যথাসর্বস্ব তাহার পদতলে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়। গোলাম যেমন প্রভুর বশীভূত থাকে লোকেও তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির আজ্ঞাবহ ও বশীভূত থাকে। শুধু তাহাই নহে, গোলাম ত বলপ্রয়োগে বশীভূত হয়, কিন্তু তাহারা স্বেচ্ছায় হৃষ্টচিত্তে বশীভূত হয়।

প্রতিপত্তি-প্রিয়তার কারণ—মোটের উপর ধন দ্বারা বস্তুসমূহের অধিকার লাভ করা যায়; আর প্রতিপত্তি দ্বারা লোকের অন্তর জয় করা চলে। তিনটি কারণে অধিকাংশ লোক ধন অপেক্ষা প্রতিপত্তিকে অধিক ভালবাসে। **প্রথম কারণ**—ধনের সাহায্যে মানুষ তাহার সকল অভাব মোচন করিতে পারে, এইজন্যই ধন প্রিয় বস্তু। প্রতিপত্তি লাভেও ঠিক এই উদ্দেশ্যেই সফল হয়। বরং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে ধন লাভ করা নিতান্ত সহজসাধ্য। অপরপক্ষে যদি কোন ইতর ব্যক্তি ধনের বলে প্রতিপত্তি লাভ করিতে চায় তবে ইহা তাহার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কারণ- চুরি, অপহরণ বা অন্য কোন কারণে ধন অতি সহজেই বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ার এইরূপ কোন আশঙ্কা নাই। **তৃতীয় কারণ**—বাণিজ্য ও কৃষিকার্যে পরিশ্রম ও কষ্ট ব্যতীত ধন বৃদ্ধি পায় না; কিন্তু প্রতিপত্তির খ্যাতি স্বতঃই বিস্তার লাভ করে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কারণ, তাহার অন্তর তোমার বশীভূত, সে তোমার যশঃগান করিয়াই বেড়াইবে এবং যাহারা কখনও তোমার দর্শন লাভ করে নাই তাহারাও ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। এইরূপে মানুষ যতই অধিক বিখ্যাত হইবে ততই তাহার প্রতিপত্তি অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

যাহাই হউক, ধন ও প্রতিপত্তির আবশ্যকতা আছে; কারণ, উহার সাহায্যেই মানবের যাবতীয় অভাব পূরণ হয়। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রিয় হইয়া উঠে এবং যে সকল স্থানে তাহার গমনের কোনই সম্ভাবনা নাই সেসব স্থানে সে সুখ্যাতি বিস্তারের কামনা করে। মানুষ সমস্ত জগত তাহার বশীভূত দেখিতে চায়, যদিও সে জ্ঞাত আছে যে, ইহার কোন আবশ্যকতা তাহার নাই। মানুষের এই সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রিয়তার পিছনে এক বিরাট রহস্য রহিয়াছে।

মানুষের প্রতিপত্তি-প্রিয়তার গূঢ় রহস্য—ফেরেশতাদের মূল উপাদানেই মানুষ সৃষ্ট এবং মানবাত্মা একমাত্র আল্লাহ্‌রই কর্মবিশেষ; যেমন তিনি বলেন-

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

"বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১০ রুকু ১৫ পারা)। মোটের উপর মহাপ্রভু আল্লাহর সহিত মানবাত্মার এইরূপ ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে বলিয়াই প্রতিপত্তি কামনা মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে। আর এইজন্যই ফিরআউন বলিয়াছিল-

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى

"আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু" (সূরা নাযিআত, ১ রুকু, ৩০ পারা)। উল্লিখিত কারণেই মানুষ প্রভুত্ব-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিপত্তির মর্ম—প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই সর্বেসর্বা থাকিবে এবং তাহার সমকক্ষ কেহই হইবে না, ইহাই প্রতিপত্তির প্রকৃত মর্ম। কারণ, অপর কেহ তাহার সমকক্ষ হইলে তাহার চরমোৎকর্ষ রহিল না ও ইহাতে অপূর্ণতা দেখা দিল। সূর্য মাত্র একটি বলিয়াই ইহা পূর্ণ ও নিষ্কলঙ্ক এবং জগতের সকল পদার্থই ইহা হইতে জ্যোতি গ্রহণ করিয়া থাকে। অপর কোন বস্তু সূর্যের সমকক্ষ থাকিলে ইহার প্রতিপত্তি ও পূর্ণতা নষ্ট হইয়া যাইত। তদ্রূপ সর্বেসর্বা হওয়া একমাত্র মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য; কারণ, বাস্তবপক্ষে সমস্ত জগত ব্যাপিয়া একমাত্র তিনিই বিরাজমান। তাঁহাকে ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই এবং যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ একমাত্র তাঁহার কুদরতের আলোমাত্র ও তাঁহার অধীন, তাঁহার কোন অংশী বা সাথী নহে। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য কর, সূর্যের আলোকরাশি ইহার অধীন এবং সূর্য হইতে পৃথক করিয়া ইহার আলোকের কল্পনাও করা চলে না; আর আলোকরাশি সূর্যের অংশী ও সাথী নহে, কেননা, অংশী ও সাথী হইলে সূর্য অদ্বিতীয় হইত না এবং ইহার অপূর্ণতা প্রকাশ পাইত। তদ্রূপ সমস্ত মাখলুকাত (সৃষ্ট পদার্থ) একমাত্র আল্লাহ্‌র জ্যোতিতেই প্রকাশিত এবং তিনি ভিন্ন অপর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

মানব প্রকৃতিই এইরূপ যে, সে সর্বব্যাপী সর্বেসর্বা হইতে আকাঙ্খা করে। কিন্তু ইহাতে অক্ষম হইয়া জগতের যাবতীয় বস্তু সে তাহার অধিকারে পাইতে চায়; অর্থাৎ সে বাসনা করে যে সমস্তই তাহার বশীভূত থাকুক এবং তাহার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হউক। পরিশেষে এই বাপারেও সে অক্ষম হইয়া থাকে; কারণ, সৃষ্ট পদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর পদার্থের উপর মানবের কোন ক্ষমতাই চলে না; যেমন- আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, ফেরেশতা, শয়তান এবং যে সকল বস্তু পৃথিবী ও সমুদ্রের নিচে এবং পাহাড়ের গর্ভে রহিয়াছে। এই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতা পরিচালনে অসমর্থ হইয়া সে বিদ্যাবলে ইহাদের তত্ত্ব লাভ করত ইহাদিগকে জ্ঞানের অধীন রাখিতে ইচ্ছা করে। এই কারণে নভোমণ্ডল এবং জল ও স্থলের যাবতীয় আশ্চর্য বিয়ষাদির জ্ঞানান্বেষণে মানুষ ব্যাপৃত হয়; যেমন যে ব্যক্তি শতরঞ্জ খেলায় অভিজ্ঞ নহে সেও ইহার জ্ঞান লাভের কামনা করে। জ্ঞানমূলক ক্ষমতাও এক প্রকার প্রভুত্ব; এইজন্যই অজানাকে জানিবার অদম্য বাসনা মানবমনে আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে। অপর শ্রেণীর পদার্থের উপর তাহার ক্ষমতা চলে; ইহা হইল উদ্ভিদ, জীবজন্তু, জড়বস্তু ইত্যাদি ভূ-পৃষ্ঠস্থ পদার্থসমূহ। মানুষ ইহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করত ইহাদিগকে ইচ্ছামত ব্যবহার ও পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করে। জগতের যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানবমন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মনরম; সুতরাং মানুষ অপরের মনকে বশীভূত করত ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার ও পরিচালনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করে যেন লোক সর্বদা তাহার স্মরণে ব্যাপৃত থাকে। ইহাই মানব প্রতিপত্তির সারমর্ম।

মানব স্বভাবতই প্রতিপত্তি প্রিয়। মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের সহিত ইহার নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তাঁহার দরবার হইতেই ইহা আসিয়া থাকে। চরম ও পরম গুণরাজিতে গুণান্বিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাব অর্জনই প্রতিপত্তির প্রকৃত অর্থ। এই অপ্রতিহত প্রভাব পূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষমতা হইতেই জন্মে। ক্ষমতা আবার ধন ও প্রভূত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব ইহাই ধনাশক্তি ও প্রতিপত্তি-প্রিয়তার একমাত্র কারণ।

ধন ও প্রতিপত্তি নিকৃষ্ট হওয়ার কারণ—এই স্থলে কেহ হয়ত প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে যে, অপ্রতিহত প্রতিপত্তির লালসা যখন মানবের প্রকৃতিগত এবং ইহা পূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষমতা ব্যতীত লাভ করা যায় না, অপরপক্ষে, জ্ঞানান্বেষণ উত্তম কার্য, কেননা জ্ঞানবলে পূর্ণতা অর্জন করা চলে, তখন ধন ও প্রতিপত্তি কামনা করাও উত্তম কার্য। কারণ ইহাতে ক্ষমতা অর্জিত হয়; আর পূর্ণ জ্ঞান যেমন আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ গুণ, অপ্রতিহত পূর্ণ ক্ষমতাও তদ্রূপ তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। সুতরাং মানব যতই পূর্ণতা লাভ করিবে ততই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সমর্থ হইবে। প্রতিবাদের উত্তর এই- পূর্ণ জ্ঞান ও অপ্রতিহত ক্ষমতা উভয়ই চরমোৎকার্যের নিদর্শন এবং মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র গুণবিশেষ। মানব প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে না। জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ লাভ করা মানবের পক্ষে সম্ভবপর এবং ইহা মানবাত্মার

সহিত চিরকাল বিরাজমান থাকে। অপ্রতিহত ক্ষমতা মানুষ কখনও অর্জন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ভুলবশত সে মনে করে যে, সে ক্ষমতা অর্জন করিয়া লইয়াছে। আবার যে তুচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া সে নিজেকে মনে করে ইহাও তাহার সহিত চিরকাল থাকে না; কারণ ধন ও জনের সহিত ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্ষমতা বিলীন হইয়া যায়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যাহা বিলুপ্ত হয় ইহাকে চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক বস্তু বলা চলে না। অতএব অস্থায়ী বস্তুর অন্বেষণে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জ্ঞানার্জনের জন্য যতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়, ইহা প্রয়োজনীয়। আল্লাহ্‌র সহিত জ্ঞানের অবস্থান, দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা আবার নিত্য ও চিরস্থায়ী। সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না; বরং কোন জ্ঞানী ব্যক্তি পরলোকগমন করিলে ইহা তাহার সঙ্গে থাকিয়া জ্যোতিস্বরূপ কাজ করে এবং এই জ্যোতিতে উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করত এমন এক অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করে যাহার তুলনায় বেহেশ্‌তের যাবতীয় সুখ অতি নগণ্য বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয় এমন বস্তুর সহিত জ্ঞানের কোন সংশ্রব নাই; ধন ও জনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বরং মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সহিত জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। কারণ, জ্ঞান আল্লাহ্‌র গুণরাজির অন্যতম। আর ইহার সম্বন্ধ আছে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডলে নিহিত হেকমতের সাথে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের সংশ্রব আছে ঐ সমস্ত বিস্ময়কর সম্ভাব্য অসম্ভাব্য এবং অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের সহিত যাহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে বোধগম্য হয়। এই ত্রিবিধ বস্তু অনাদি ও অনন্ত; উহাদের কোন পরিবর্তন নাই। কারণ, অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব কখনও অসম্ভাব্য হয় না এবং অসম্ভাব্য কখনও সম্ভাব্য হইতে পারে না। আদি, উদ্ভূত ও নশ্বর বস্তুর সহিত যে জ্ঞানের সম্পর্ক রহিয়াছে, ইহা নিতান্ত নগণ্য; যেমন ভাষা জ্ঞান। কেননা ভাষা উদ্ভূত ও নশ্বর। অবশ্য কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের মর্ম উদঘাটনে ভাষা জ্ঞানের সাহায্য পাওয়া যায় বলিয়াই ইহার মর্যাদা দেওয়া হয়। আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ ও তাঁহার পথে চলার কালে বিপদ সমাকীর্ণ ভয়াবহ ঘাটিসমূহ পার হওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের জ্ঞান অপরিহার্য। মোটের উপর কথা এই যে, ধ্বংসী ও পরিবর্তনশীল বস্তুর জ্ঞান মানুষের লক্ষ্যবস্তু নহে। বরং ইহা অনন্ত জ্ঞানের অবলম্বন মাত্র। আর চিরন্তন অস্তিত্বের জ্ঞান মঙ্গলময় চিরস্থায়ী বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাহা অনাদি ও অনন্ত ইহাই আল্লাহ্‌র দরবার। অনাদি ও অনন্ত বস্তুতে কোন পরিবর্তন নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি যত অধিক এই জ্ঞান অর্জন করিতে পারে সে তত অধিক আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়।

ফল কথা, মানুষ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে, প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এক প্রকার ক্ষমতাও চিরস্থায়ী মঙ্গলময় বস্তুর মধ্যে গণ্য। ইহা

হইতেছে স্বাধীনতা; অর্থাৎ মানবের অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্তি লাভ করা। কারণ, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বন্ধনে আবদ্ধ সে বাস্তব পক্ষে প্রবৃত্তিরই গোলাম। প্রবৃত্তির অনুসরণ মানবের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ বটে। এই ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রবৃত্তির শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া ইহার উপর বিজয়ী হইতে হইবে। ইহা করিতে পারিলে মানুষ মহাপ্রভু আল্লাহ্‌ ও ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত হইয়া উঠে; কেননা ইহাতে সে পরিবর্তন, বিবর্তন ও অভাব হইতে দূরে থাকিতে পারে। সুতরাং মানুষ যতই প্রবৃত্তির নাগপাশ ছিন্ন করত পরিবর্তন, বিবর্তন ও অভাব হইতে দূরে অবস্থান করিবে ততই সে ফেরেশতাতুল্য হইয়া উঠিবে। মোট কথা এই যে, জ্ঞান ও আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করা এবং প্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্ত হওয়া বাস্তব পক্ষে মানবের পরম গুণ। অপরদিকে ধন ও প্রভুত্ব কোন গুণ নহে; কারণ এই উভয়ই ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয়। গুণ ও পূর্ণতা অর্জনের জন্য মানুষ আদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু সে প্রকৃত গুণ ও পূর্ণত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। যাহা গুণ নহে তাহাকে গুণ মনে করত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া চরম পূর্ণতা হইতে সে উদাসীন রহিয়াছে। ধন-লালসা ও প্রভুত্ব প্রিয়তার মোহে ধ্বংসের পথে সে চলিয়াছে। এইজন্যই আল্লাহ্‌ বলেন–

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ

"আসরের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে।" (সূরা আসর, ৩০ পারা)।

পরিমিত সম্মান ও প্রভুত্ব নির্দোষ—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, ধন মাত্রই যেমন নিন্দনীয় নহে, বরং অভাব মোচনের উপযোগী ধন পরকালের পাথেয় বলিয়া গণ্য হয় এবং অতিরিক্ত ধনে মন নিমজ্জিত হইয়া গেলেই মানুষ পরকালের পথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সম্মান ও প্রভুত্বের অবস্থাও তদ্রূপ। পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত সংসারে জীবন যাপন করা দুষ্কর। এইজন্য বন্ধু ও পরিচারকের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা রহিয়াছে। অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে লোককে রক্ষা করিবার জন্য বাদশাহ্‌ বা শাসনকর্তারও আবশ্যক এবং লোকের অন্তরে বাদশাহ্‌ বা শাসনকর্তার প্রতি সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ভাব থাকাও উচিত। অতএব প্রয়োজনীয় কার্যোদ্ধার করার জন্য যতটুকু সম্মান ও প্রভুত্বের আবশ্যক অপরের নিকট নিজকে ততটুকু সম্মানিত ও প্রভুত্বশালী করিয়া তোলাতে কোন দোষ নাই; যেমন হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম বলিয়াছিলেন- اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ "অবশ্য আমি অভিজ্ঞ রক্ষক।" (সূরা ইউসুফ, ৭ রুকু, ১৩ পারা)। তদ্রূপ শিষ্যের প্রতি যদি শিক্ষকের স্নেহ না থাকে তবে তিনি শিক্ষাদান করিবেন না এবং শিক্ষকের প্রতি শিষ্যের ভক্তি-শ্রদ্ধা না থাকিলে সেও

তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিবে না। সুতরাং অভাব মোচনের উপযুক্ত ধনার্জন যেমন নির্দোষ, আবশ্যক পরিমাণ সম্মান লাভ ও প্রভুত্ব স্থাপনের আকাঙ্খাও তদ্রূপ দূষণীয় নহে।

সম্মান ও প্রভুত্ব লাভের উপায়—সম্মান ও প্রভুত্ব লাভের চারিটি উপায় আছে; তন্মধ্যে দুইটি হারাম ও দুইটি মুবাহ্ (নির্দোষ)।

প্রথম হারাম উপায়—ইবাদত প্রকাশ করিয়া সম্মান ও প্রভুত্ব লাভের আশা করা। কারণ, লোক দেখানো ইবাদতকে রিয়া বলে এবং ইহা হারাম। ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত; সুতরাং সম্মান ও প্রভুত্ব লাভের আশায় ইবাদত করা সম্পূর্ণ হারাম।

দ্বিতীয় হারাম উপায়—প্রতারণা। বাস্তবপক্ষে যে গুণ নিজের মধ্যে নাই প্রতারণাপূর্বক সেই গুণের অধিকারী বলিয়া নিজকে প্রকাশ করা; যেমন কেহ যদি বলে- "আমি সৈয়দ বংশোদ্ভূত," বা "অমুক অমুকের সহিত আমার আত্মীয়তা আছে;" অথচ এই সবই মিথ্যা; অথবা কোন বিশেষ শিল্প বা ব্যবসা সম্পর্কে কিছু না জানিয়াও এই বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া নিজকে পরিচয় দেওয়া। প্রতারণাপূর্বক ধন সংগ্রহ করা যেমন হারাম, প্রতারণা দ্বারা সম্মান লাভ করাও তদ্রূপ হারাম।

প্রথম মুবাহ উপায়—ধোঁকা-প্রবঞ্চনা যাহাতে নাই এবং যাহা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নহে, এমন বস্তু বা কার্য প্রকাশ করিয়া সম্মান লাভের কামনা করা।

দ্বিতীয় মুবাহ উপায়—স্বীয় দোষ-ত্রুটি গোপন করা। নিজের পবিত্রতা ও সাধুতা প্রকাশের উদ্দেশ্য না থাকিলে বাদ্‌শাহ বা শাসনকর্তার সম্মানভাজন হওয়ার জন্য স্বীয় দোষ-ত্রুটি গোপন করা দুর্বৃত্ত ফাসিকের পক্ষেও জায়েয।

সম্মান-লিপসা ও প্রভুত্ব দমনের উপায়

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, সম্মান-লিপ্‌সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিলে আত্মা পীড়িত হইয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাত ইহার চিকিৎসায় তৎপর হওয়া আবশ্যক। ধনাশক্তির ন্যায় সম্মান-লিপ্‌সা এবং প্রভুত্ব-প্রিয়তাও মানব মনকে কপটতা, রিয়া, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শত্রুতা, ঈর্ষা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি পাপের দিকে আকর্ষণ করে। বরং সম্মান-লিপ্‌সা এবং প্রভুত্ব-প্রিয়তা ধনাশক্তি অপেক্ষা জঘন্যতর; কেননা, সম্মান-লিপ্‌সা এবং প্রভুত্ব-প্রিয়তা মানব মনে তদপেক্ষা অধিক প্রবল হইয়া থাকে। যে পরিমাণ ধন ও সম্মান অর্জন করিলে ধর্মকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়, ততটুকু লাভ করত যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত থাকে এবং ইহার অতিরিক্ত কামনা করে না, তাহার আত্মা পীড়িত নহে। এইরূপ ব্যক্তি বাস্তব পক্ষে ধন ও সম্মানের প্রতি আসক্ত নহে; বরং উদ্বেগহীন চিত্তে ধর্মকর্ম সমাধা করিবার প্রচুর অবসর লাভ করাই তাহার একমাত্র

লক্ষ্য। কিন্তু সম্মানভাজন হওয়ার চিন্তায়ই সর্বদা বিভোর থাকে, এমন সম্মান-লোলুপ লোকও জগতে বিরল নহে। "লোকে আমাকে কিরূপ চক্ষে দেখে? তাহারা আমার সম্পর্কে কি বলে এবং বিরূপ ধারণা পোষণ করে?"- শত কাজে লিপ্ত থাকিলেও এবং বিধ চিন্তাসমূহ তাহাদের সমস্ত মন জুড়িয়া থাকে। তদ্রূপ পীড়িত ব্যক্তির জন্য এই পীড়ার চিকিৎসা অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞান ও অনুষ্ঠানের মিশ্রণে ইহার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জ্ঞানমূলক ঔষধ—সম্মান-লিপ্‌সাও প্রভুত্ব-প্রিয়তা ইহ-পরকালের কিরূপ দুর্গতির কারণ হইয়া থাকে তৎসম্পর্কে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া লওয়া। প্রভুত্ব-প্রিয় ব্যক্তি সর্বদা মানসিক যাতনা ও অপমান ভোগ করে এবং লোকের মনস্তুষ্টি বিধানের কার্যে ব্যাপৃত থাকে (কারণ, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করত সে অহরহ অন্য লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণের চিন্তায় ব্যাকুল থাকে)। ইহাতেও প্রভুত্ব স্থাপনে অক্ষম হইলে সে নিজকে নিজে অপদস্থ মনে করিয়া দুঃখকষ্টে জর্জরিত হইতে থাকে। আবার প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইলে অপর লোক ঈর্ষার বশীভূত হইয়া তাহাকে দুঃখকষ্টে ফেলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে সে সর্বদা শত্রুপ্রদত্ত যাতনায় জর্জরিত ও অপর প্রভুত্ব লোলুপ ব্যক্তির প্রতিযোগিতা দমনের কষ্টে নিপীড়িত হইতে থাকে। ধোঁকা, প্রবঞ্চনা ও ছলেবলে অপর লোকে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বিনাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে; ইহাতে তাহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হয়। আর শত্রুদের সহিত প্রতিযোগিতায় সে পরাজিত হইলে তো তাহার অপমানের সীমাই থাকে না। আবার বিজয়ী হইলেও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিতান্ত অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর। কেননা, অপর লোকের অন্তরের সহিত ইহার সম্পর্ক; সামান্য কারণে হঠাৎ তাহাদের মন বিগড়াইয়া যাইতে পারে। জনসাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত ক্ষণিকে উঠিয়া ক্ষণিকেই বিলীন হইয়া যায়। ইতর জনসাধারণের মনের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত ভক্তিসৌধ নিতান্ত দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী, বিশেষভাবে যাহাদের সম্মান রাজ-ক্ষমতা বা নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকার দরুন হইয়া থাকে তাহাদের সম্মান আরও অধিকতর ক্ষণভঙ্গুর; কেননা, যে কোন মুহূর্তে পদচ্যুতির আশঙ্কা রহিয়াছে, কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইলে পদচ্যুতি ঘটে এবং ফলে অপদস্থ হইতে হয়। প্রভুত্ব লোলুপ ব্যক্তি ইহকালে ত মনঃকষ্টে জর্জরিত থাকেই পরকালেও সে তদ্রূপ যাতনা ভোগ করিবে।

অপরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকে প্রভুত্ব-প্রিয়তার দুর্গতি উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সম্যক বুঝিতে পারেন যে, নিখিল বিশ্বের একাধিপত্য যদি কাহারও লাভ হয় এবং সমস্ত লোক তাহাকে সিজদা করে, তথাপি ইহাতে আনন্দিত হওয়ার কিছুই নাই, কারণ, অল্পদিনের মধ্যেই সেও থাকিবে না এবং তাহার

সিজদাকারীগণও থাকিবে না; অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আসিয়া সকলের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া দিবে। এই বিশাল সাম্রাজ্য তাহার পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে এবং সে পূর্বকালের বাদশাহদের ন্যায় মাটিতে মিশিয়া যাইবে- যাহাদের কথা আজ কেহ ভুলেও স্মরণ করে না। অতএব সম্মান ও প্রভুত্বের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তি ইহকালের ক্ষণিক আনন্দের বিনিময়ে পরকালের অশেষ আনন্দ ও চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য বিসর্জন দেয়। এইরূপ ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্-প্রেম থাকিতে পারে না; অথচ আল্লাহ্-প্রেম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অন্তরে প্রবল থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি পরলোকগমন করিলে সে দীর্ঘকাল কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে। এই কথাগুলি ভালরূপে হৃদয়গতভাবে বুঝিয়া লওয়াই সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার জ্ঞানমূলক ঔষধ।

অনুষ্ঠানমূলক ঔষধ—সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা দমনের অনুষ্ঠানমূলক উপায় দুইটি। **প্রথম উপায়-** যে স্থানের লোকে তোমাকে সম্মান করে সে স্থান হইতে পলায়ন করত এমন অজ্ঞাত স্থানে চলিয়া যাইবে যথায় কেহই তোমাকে জানে না। ইহাই পূর্ণ ও উত্তম ব্যবস্থা। তুমি যদি স্বীয় স্থানে অবস্থানপূর্বক নির্জন বাস অবলম্বন কর তবুও লোকে ইহা জানিতে পারিলে তোমার বিস্তর অনিষ্ট হইবে। তুমি নির্জনতা অবলম্বন করিয়াছ জানিয়া লোকে যখন তোমাকে তিরস্কার করে বা কপটতা বশতঃ তুমি নির্জনতা অবলম্বন করিয়াছ বলিয়া প্রকাশ করে, তখন যদি তুমি মনে কষ্ট ও যাতনা অনুভব কর, অথবা তাহারা যদি তোমাকে দোষারোপ করে তখন যদি তুমি তোমার প্রতি তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য ইহার প্রতিবাদ কর, তবেই বুঝা যাইবে যে, এখনও তোমার হৃদয়ে সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা রহিয়াছে। **দ্বিতীয় উপায়-** লোকদের তিরস্কারের পথ অবলম্বন করিবে এবং এমন এমন কার্য করিবে যেন লোকচক্ষে তুমি হেয় বলিয়া পরিগণিত হও। ইহার অর্থ হারাম ভক্ষণ করা নহে, যেমন বর্তমান একদল নির্বোধ লোক নিজদিগকে তিরস্কৃত করিতে যাইয়া ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করিতেছে; বরং সংসার বিরাগী পরহেযগারগণ যেরূপ কার্য করিতেন তদ্রূপ কার্য করিবে।

কোন শহরে একজন সংসারবিরাগী দরবেশ বাস করিতেন। বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেই শহরের শাসনকর্তা তাঁহার নিকট গমন করিতেন। একদা দরবেশ শাসনকর্তাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া রুটি ও তরকারি চাহিয়া লইলেন এবং খুব তাড়াহুড়া করিয়া বড় বড় লুকমা মুখে পুরিয়া দিতে লাগিলেন। শাসনকর্তা ইহা দেখিয়া দরবেশকে অতি লোভী বলিয়া মনে করিলেন এবং দরবেশের প্রতি তাঁহার সকল ভক্তি-শ্রদ্ধা বিনষ্ট হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ শাসনকর্তা প্রত্যাবর্তন করিলেন। অপর এক শহরে এক কামিল বুযুর্গ বাস করিতেন। লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা

করিত এবং সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। একদা গোসলান্তে স্বীয় ছিন্নবস্ত্র গোসলখানায় রাখিয়া দিয়া তিনি অপর লোকের উৎকৃষ্ট ও বহু মূল্য পোশাক পরিধান করত বাহিরে আসিলেন এবং নিকটবর্তী এক প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ধরিয়া খুব মারপিট করিল এবং বলিল-"এই ব্যক্তি চোর।" অপর এক বুযুর্গের ঘটনা এই যে, তিনি লোকের সম্মুখে মদের রঙবিশিষ্ট শরবত গ্লাসে ঢালিয়া পান করিতেন যেন তাহারা তাঁহাকে মদ্যপায়ী বলিয়া মনে করে। সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা ছিন্ন করিবার উপায় এই পর্যন্ত বর্ণিত হইল।

প্রশংসা-অনুরাগ ও দুর্নাম-বিরাগ কর্তনের উপায়

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, কোন কোন ব্যক্তি লোকমুখে স্বীয় প্রশংসা শুনিতে চায় এবং সর্বদা যশ ও সুখ্যাতির অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, যদিও তাহারা শরীয়তবিরুদ্ধ গর্হিত কার্যেই ব্যাপৃত থাকুক না কেন। আর তাহাদের মন্দ কার্যের জন্য যদি লোকে যথার্থভাবেই তাহাদিগকে তিরস্কার করে তবুও তাহারা বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়। এই অবস্থায় উপনীত ব্যক্তির হৃদয় জঘণ্য পীড়ায় আক্রান্ত। প্রশংসায় আনন্দ ও দুর্নামে কষ্ট হওয়ার কারণ উপলব্ধি না করা পর্যন্ত এই পীড়ার চিকিৎসা হইতে পারে না। প্রিয় পাঠক, অবগত হও, চারিটি কারণে মানুষ স্বীয় প্রশংসায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে।

প্রথম কারণ—স্বীয় পূর্ণতা উপলব্ধি। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষ স্বীয় কৃতিত্ব অত্যন্ত ভালবাসে এবং দোষ-ত্রুটিকে ঘৃণা করে। প্রশংসাকে সে কৃতিত্ব বলিয়া মনে করে। কারণ, মানুষ স্বীয় কৃতিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে হইতে পারে না। সুতরাং লোকমুখে প্রশংসা শুনিলেই এই সন্দেহ বিদূরীত হইয়া স্বীয় কৃতিত্বের প্রতি তাহার আস্থা জন্মে এবং সে তখনই পূর্ণ আনন্দ ও আরাম পায়। আর তখন তাহার মনও প্রশংসা লাভের দিকে আকৃষ্ট হয়। কেননা কৃতিত্ব প্রভুত্বের নিদর্শন এবং মানুষ স্বভাবতই প্রভুত্ব প্রিয়। অপরপক্ষে, লোকমুখে দুর্নাম শুনিলে সে স্বীয় দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতা বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইয়া থাকে। স্বীয় গুণ বা দোষের যত দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় আনন্দ বা দুঃখ তত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইজন্যই যাহারা বাচাল নহে এবং বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, যেমন- শিক্ষক, বিচারক, আলিম- এই প্রকার লোকের মুখে প্রশংসা বা নিন্দা শুনিলে অধিক আনন্দ বা দুঃখ হইয়া থাকে। আবার কোন অজ্ঞ লোক প্রশংসা বা নিন্দা করিলে তত আনন্দ বা কষ্ট হয় না। কেননা, ইহাতে স্বীয় গুণ বা দোষ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না।

দ্বিতীয় কারণ—স্বীয় প্রভুত্বের উপলব্ধি। অপরের মুখে প্রশংসা শ্রবণ করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, প্রশংসাকারীর হৃদয় বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার হৃদয়ে প্রশংসিত ব্যক্তির স্থান ও তাহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রহিয়াছে। যশস্বী লোকের মুখে স্বীয় প্রশংসা শুনিলে অত্যাধিক আনন্দ হইয়া থাকে। কারণ, এই প্রকার লোকের মন বশীভূত করিতে পারিলে প্রভুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রশংসাকারী ইতর লোক হইলে তাহার প্রশংসায় কোনই আনন্দ পাওয়া যায় না।

তৃতীয় কারণ—প্রশংসায় প্রশংসাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির আনন্দ। প্রশংসা এই আনন্দবার্তা বহন করিয়া আনে যে, অপরাপর লোকের মনও অদূর ভবিষ্যতের প্রশংসিত ব্যক্তির বশীভূত হইয়া পড়িবে। কেননা, প্রশংসা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহারা প্রংশসিত ব্যক্তির প্রতি ভক্তিবান হইয়া উঠে। গণ্যমান্য ব্যক্তি লোক-সম্মুখে প্রশংসা করিলে ইহা অত্যধিক আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। নিন্দাবাদে ইহার বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

চতুর্থ কারণ—স্বীয় প্রভাব বিস্তারের আনন্দ। লোকমুখে প্রশংসা শুনিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রশংসাকারী প্রশংসিত ব্যক্তির প্রভাবে পরাভূত হইয়াছে। প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক সময় অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগে অর্জিত হইয়া থাকে; তথাপি ইহা মানুষের প্রিয় বস্তু। যদিও প্রতীয়মান হয় যে, প্রশংসাকারী ভক্তির আবেগে প্রশংসা করিতেছে না, বরং অভাব মোচন বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছে তবুও প্রশংসিত ব্যক্তি স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি অনুভব করত আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু কেহ মিছা-মিছি প্রশংসা করিলে প্রশংসিত ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারে যে, ইহা মিথ্যা, শ্রোতৃমণ্ডলীও ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে না, আর প্রশংসাকারীও অন্তরের সহিত প্রশংসা করিতেছে না বা সে ভয়ে ভীত হইয়াও প্রশংসা করিতেছে না, কেবল ঠাট্টা করিতেছে, এমতাবস্থায় প্রশংসিত ব্যক্তি কোনই আনন্দ পাইবে না, কেননা এইরূপ স্থলে আনন্দ লাভের মৌলিক কারণই বিদূরিত হইয়া গেল।

প্রশংসা-লালসা দমনের উপায়

প্রিয় পাঠক, প্রশংসা-লালসার কারণসমূহ অবগত হওয়ার পর উহা দমনের উপায় সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। আর চেষ্টা করিলে অবশ্যই প্রশংসা-লালসারূপ আন্তরিক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

প্রথম উপায়—লোকমুখে নিজের প্রশংসা শুনিলেই স্বীয় পূর্ণতা ও গুণ সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে; ফলে অন্তরে আনন্দ অনুভূত হয়। এমতাবস্থায়, তোমার চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক, পরহেযগারী, জ্ঞান ইত্যাদি যে সকল গুণের অধিকারী বলিয়া লোকে তোমার প্রশংসা করিতেছে, বাস্তবপক্ষে উহা তোমাতে আছে কিনা। বাস্তবিকই তুমি এই সকল গুণের অধিকারী হইয়া থাকিলে লোকমুখে প্রশংসা শুনিয়া তোমার পক্ষে আনন্দিত হওয়া উচিত নহে; বরং যে করুণাময় আল্লাহ্ তোমাকে উহা দান করিয়াছেন তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আনন্দিত হওয়া উচিত। কারণ, অপরের প্রশংসায় তোমার গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না এবং হ্রাসও হইবে না। আর ঐশ্বর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি পার্থিব বিষয়াদি অবলম্বনে লোকে তোমার প্রশংসা করিলে এই সকল ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে আনন্দিত হওয়ার কোন কারণই নাই। অপার্থিব চিরস্থায়ী গুণের অধিকারী হইয়া আনন্দিত হওয়া শোভন হইলেও লোকমুখে ইহার প্রশংসা শুনিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নহে। নিষ্ঠাবান মুহাক্কিক আলিমগণ নিজেদের জ্ঞান ও পরহেযগারী সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও পরিণাম চিন্তায় তাঁহারা আনন্দিত হইতে পারেন না; কেননা, মৃত্যুকালে তাঁহারা তৎসমুদয় গুণ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন, না বেঈমান হইয়া রিক্ত হস্তে জীবনের পরপারে যাত্রা করিতে হইবে, ইহা কাহারও জানা নাই। সুতরাং মৃত্যুর পর পরিণাম অজ্ঞাত বলিয়া চিরহিতকারী স্থায়ী জ্ঞান, পরহেযগারী ইত্যাদি গুণের উপর ভরসা করিয়াও আনন্দ অনুভব করা চলে না। অতএব অনুধাবন কর, সৎকর্মশীল সুনিপুণ আলিমদের অবস্থাই যখন এইরূপ আশঙ্কাজনক, এমতাবস্থায়, যাহাদের পরিণাম স্থানে দোযখ, তাহাদের আনন্দিত হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে?

অপরপক্ষে, জ্ঞান, পরহেযগারী ইত্যাদি যে সমুদয় গুণের কথা উল্লেখ করিয়া লোকে তোমার প্রশংসা করিতেছে উহা যদি তোমাতে না থাকে, আর তুমি তদ্রূপ গুণকীর্তন শুনিয়া উৎফুল্ল হও, তবে তোমাকে নিতান্ত বোকা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? ইহার উদাহরণ এইরূপ- যেমন, একজন অপরজনকে প্রশংসা করিয়া বলিল- "মহাত্মন, আপনি পরম শ্রদ্ধাভাজন। আপনার নাড়িভুড়ি আতর ও মহামূল্য মৃগনাভিতে পরিপূর্ণ।" প্রশংসিত ব্যক্তি উত্তমরূপেই অবগত আছে যে, তাহার উদরে পূতিগন্ধময় অপবিত্র মল-মূত্র ব্যতীত আর কিছুই নাই; তথাপি উক্তরূপ চাটুবাদ শুনিয়া তাহার আনন্দ আর ধরে না। ইহাকে পাগলামি ছাড়া আর কি বলা চলে?

প্রশংসা-প্রিয়তার যে চারিটি কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম কারণের প্রতিষেধক ব্যবস্থা এইস্থলে প্রদর্শন করা হইল। সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা হইতেই প্রশংসা-প্রীতির অন্যান্য কারণ উদ্ভূত এবং ইহা দমনের উপায়ও ইতিপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিন্দিত ব্যক্তির কর্তব্য—কেহ নিন্দা করিলে নিন্দুকের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হওয়া নির্বুদ্ধিতার কার্য। তোমার কোন দোষ দেখিয়া তোমাকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে যদি নিন্দুক সত্য কথা বলিয়া থাকে, তবে ফেরেশতা জ্ঞানে তাহাকে শ্রদ্ধা করিবে। সে যদি জানিয়া শুনিয়া তোমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে, তবে সে মানবরূপী শয়তান। আর না জানিয়া না শুনিয়া তোমার কুৎসা রটনা করিয়া থাকিলে সে নিরেট বোকা, গর্দভসদৃশ। আল্লাহ্ যদি কাহারও আকৃতি রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে গর্দভ, শয়তান বা ফেরেশতাতে পরিণত করিয়া দেন, তবে তোমার অসন্তুষ্ট হওয়ার কি কারণ আছে? নিন্দুক যদি যথার্থই বলিয়া থাকে অর্থাৎ তোমাতে বাস্তবিক কোন দোষ থাকে এবং ইহা ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তুমি যে এইরূপ দোষে দোষী তজ্জন্য তোমাকে অবশ্যই দুঃখিত হওয়া উচিত; অপরে দোষারোপ করিয়াছে বলিয়াই অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর সাংসারিক কোন বিষয়ে ত্রুটি অবলম্বনে তোমার প্রতি দোষারোপ হইয়া থাকিলে জানিয়া রাখ, ধর্মপরায়ণ লোকের নিকট ইহা ত্রুটি নহে, বরং গুণ।

দ্বিতীয় উপায়—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, নিম্নোক্ত তিনটি অভিপ্রায়ের যে কোন একটির বশবর্তী হইয়া নিন্দুক নিন্দা করিয়া থাকে।

প্রথম—তোমাতে অবশ্যই কোন দোষ আছে। নিন্দুক তোমার সংশোধনের জন্য সদয় অন্তঃকরণে তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। এমতাবস্থায়, তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক; কেননা, কেহ যদি তোমার পরিহিত বস্ত্রে সর্প দেখিয়া ইহার দংশন যাতনা হইতে তোমার পরিত্রাণের নিমিত্ত তোমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া থাকে, তবে তুমি তো তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া থাক। ধর্মকর্মে দোষ-ত্রুটি সর্প অপেক্ষাও মারাত্মক অনষ্টিকর; কারণ সর্প দংশন-যাতনা তো ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ধর্মকর্মে দোষ-ত্রুটি পরকালের অনন্ত জীবনে অসীম যাতনা দিতে থাকিবে। মনে কর, তুমি বাদশাহর দরবারে চলিয়াছ। তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার পরিহিত বস্ত্র মলমূত্রে দুর্গন্ধময় ও অপবিত্র হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া অপর এক ব্যক্তি তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল- "ভাই, তোমার পরিহিত বস্ত্রে মলমূত্র রহিয়াছে, সর্বাগ্রে ইহা পরিষ্কার করিয়া লও এবং তৎপর বাদশাহর দরবারে গমন কর।" তুমিও দেখিতে পাইলে যে, তোমার বস্ত্র মলমূত্রে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, গমন করিলে বাদশাহর বিরাগভাজন হইয়া তোমার লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অতএব যাহার কারণে তুমি পরিত্রাণ পাইলে তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কি তোমার উচিত নহে?

দ্বিতীয়—তোমার দোষ বাস্তবিকই আছে। তবে সেই ব্যক্তি বিদ্বেষভাবে তোমার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাতে তাহার ধর্মহীনতার পরিচয় পাওয়া গেল; কিন্তু তোমার উপকার ব্যতীত অপকার হইল না। নিন্দায় তোমার লাভ ও নিন্দুকের ক্ষতি হইল। সুতরাং তোমার ক্রুদ্ধ হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে?

তৃতীয়—নিন্দুক তোমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিতেছে। এমতাবস্থায়, অনুধাবন কর, নিন্দুক যে দোষের জন্য তোমার নিন্দা করিতেছে, তুমি এই বিষয়ে নির্দোষ হইলেও ইহা ব্যতীত তোমার বহু দোষ রহিয়াছে, যাহা সেই ব্যক্তি অবগত নহে। সুতরাং, নিন্দুকের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া মহাপ্রভু আল্লাহ্‌কে অশেষ ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যক। কারণ, তিনি তোমার অন্যান্য দোষ লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন এবং অপবাদকারী মিছামিছি দোষারোপ করিয়া স্বীয় পুণ্যসমূহ তোমাকে উপহার দিতেছে। সে তোমার প্রশংসা করিলে ইহা তোমাকে হত্যা করার তুল্য হইত। অতএব, যে ব্যক্তি তোমাকে হত্যা করিবার পরিবর্তে তাহার পুণ্যসকল তোমাকে দান করিল, তাহার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইবে কেন? যাহাদের দৃষ্টি কর্মের বাহ্য আকৃতির প্রতি নিবদ্ধ এবং ইহার নিগূঢ় মর্ম ও মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে যাহারা অক্ষম, কেবল তাহারাই নিন্দুকের প্রতি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, বুদ্ধিমান ও নির্বোধের মধ্যে ইহাই পার্থক্য; বুদ্ধিমানের দৃষ্টি প্রত্যেক কর্মের নিগূঢ় মর্ম ও মূলতত্ত্বের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, বাহ্য আকৃতির দিকে তাঁহারা দৃকপাত করেন না।

মোটের উপর কথা এই যে, মানবজাতি হইতে আশা-আকাঙ্খার সম্পূর্ণরূপে কর্তন না করা পর্যন্ত প্রশংসা-লালসারূপ মানসিক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে না।

প্রশংসা ও নিন্দা বিষয়ে মানুষের শ্রেণীবিভাগ

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, প্রশংসা ও নিন্দা শ্রবণে মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের তারতম্যানুসারে মানুষ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী-সর্বসাধারণ লোকজন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহারা নিজেদের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত হয় এবং নিন্দা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হইয়া উঠে। তাহারাই নিকৃষ্টতম শ্রেণীর মানুষ।

দ্বিতীয় শ্রেণী—সাধারণ পুণ্যবান লোকগণ। এই শ্রেণীর লোকেরা প্রশংসা শ্রবণে আনন্দিত ও নিন্দা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হয়; কিন্তু বাক্যে বা আচরণে ইহা প্রকাশ পায় না। বরং প্রকাশ্যভাবে তাহারা উভয়ের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করিয়া থাকে; তবে গুপ্তভাবে অন্তরে প্রশংসাকারীকে ভালবাসে এবং নিন্দুককে শত্রু বলিয়া গণ্য করে।